অক্ষরে অক্ষরে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অক্ষরে অক্ষরে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

প্রথম দে'জ সংস্করণ : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১৩৮১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯০
জানুয়ারী ১৯৮৪

আট টাকা

প্রচ্ছদচিত্রী: শ্রীরবীন দত্ত

প্রকাশক : শ্রী সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩।

মুদ্রাকর : মোহনচন্দ্র পাল, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিণ্টার্স,
৪/১ই, বিডন রো, কলিকাতা ৭০০০০৬।

উৎসর্গ

লালটু, মিউ, মাতুন, বেবে
আর বুম্‌লা-কে

অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে অক্ষরে

ভাষা ১১

হাতের লেখা ২২

সবকিছুর গোড়ায় ৩৪

ছিরি-ছাঁদ ৩৭

নকল থেকে নাচ ৫২

গানবাজনা ৬২

পালাবদলের পালা ৭১

যম-নিয়তি যক্ষ ৮৪

পালট পুরাণ ৯০

এ বইয়ের দোসর :

'কথার কথা'

দাঁড়াও। এক মিনিট।—

হয়েছে। আচ্ছা, বলো তো এই এক মিনিট আমি কী ভাবছিলাম? হাজার মাথা খুঁড়লেও বলতে পারবে না।

আমি জানালে পরে তবেই তুমি জানতে পারো। না জানালে কেমন করে জানবে? জানাবার এই উপায়টার নামই ভাষা।

তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে চিৎকার করলেও তোমার কানে যাবে না।

তাহলে উপায়? উপায় আমার হাতেই আছে। মুখের ভাষাটাকে যদি কোনো কিছুতে ধরে তোমার কাছে পৌছে দিতে পারি, তাহলেই আর কোনো মুশকিল থাকে না। ভাষা পৌছে দেবার এই উপায়টার নামই লেখা।

জানবার আর জানাবার কিসের এতো মাথাব্যথা? চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই হয়! চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে মানুষ আর মানুষ হতে পারতো না। আজও ল্যাজ উঁচু করে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হতো।

হাতের জোরেই মানুষ পেরেছে জানতে আর জানাতে; শিখেছে কথা বলতে, নাচগান করতে, কবিতা বানাতে। কাজ থেকেই এসেছে তাল-মান-ছন্দ।

শিল্প-সাহিত্য তাহলে আকাশ থেকে পড়েনি। সমাজ থেকেই উঠেছে। তার প্রমাণ? এ বইতে পাওয়া যাবে অজস্র প্রমাণ।

সমাজের ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যে। জলে যেমন গাছের ছায়া পড়ে, ঠিক তেমনি? না। শিল্প-সাহিত্য সমাজের অকর্মণ্য ছায়া নয়।

ভস্মলোচনের গল্প জানো? ভস্মলোচন যা-কিছু দেখতো, তাই পুড়ে যেতো। যেদিন সে ছায়ার মধ্যে নিজেকে দেখলো, সেদিন নিজেই সে পুড়ে গেলো।

ভস্মলোচনের মতো যে সমাজ বেশির ভাগ মানুষকে দগ্ধায়, তার ছায়া ফুটিয়ে তুলে শিল্প-সাহিত্য সেই সমাজকে ধ্বংস করার কাজে হাত লাগাতে পারে।

তেমনি আবার নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন জীবন এগিয়ে আনবার কাজে সহায় হতে পারে শিল্প-সাহিত্য।

তার প্রমাণ? এ বইতে তার অজস্র প্রমাণ।

এক কথায়, মানুষের হাত দেখে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা বলা।

হাতের মধ্যে কী আছে? আছে কাজ, আছে কথা। মুঠোর মধ্যে? জগৎ।

পাহাড় বোঝাতে যদি খোদ পাহাড়টাকে হাজির করতে হতো, তাহলে কী মুশকিলে পড়তে বলো তো ? যদি ধরেও নিই তুমি মস্ত বড়ো বীর, তাহলেও কি রক্ষে ছিলো ? তোমার ল্যাজ দেখবার জন্যে রীতিমত লোকের ভিড় জমে যেতো। কেননা, গন্ধমাদন পাহাড়টা তুলে এনেছিলো কে ? হনুমান না ?

॥ বোঝা আর বোঝানো ॥

তার চেয়ে কাজটা বেজায় হাল্কা করে দিতে পারে পাথরের ছোট্ট একটা নুড়ি। যদি আমরা ঠিক করে নিই নুড়িটা সামনে ধরলেই পাহাড় বুঝবে—তাহলে আর পাহাড়টাকে নড়াবার কোনো দরকারই হয় না। তেমনি নদী বোঝাবার জন্যে একটা সুতো, গাছ বোঝাবার জন্যে একটা খড়্‌কে দিয়ে কাজ চলতে পারে।

কিন্তু ভারির বদলে হাল্কা, বড়োর বদলে ছোট্ট জিনিস দিয়ে বোঝাতে গেলেও সব সময় ঘাড়ে পর্বতপ্রমাণ মোট নিয়ে ঘুরতে হবে। কোনটা কখন বোঝানোর দরকার পড়ে বলা তো যায় না, কাজেই কোনো জিনিসই বাদ দেওয়া চলবে না।

ধরো, রাস্তা দিয়ে তুমি যাচ্ছো। একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। লোকটাকে দাঁড় করিয়ে তুমি গাছের কথা বলতে চাও। তার জন্যে কিন্তু ঝুলি থেকে খড়্‌কেটা বার করতে হবে। লোকটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুমি ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে খড়্‌কেটা খুঁজতে লাগলে। নুড়ি পাওয়া যাচ্ছে, সুতো পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু হাজারগণ্ডা জিনিসের ভিড়ে খড়্‌কেটা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন সেটা পাওয়া গেলো, তখন দেখলে যাকে বোঝানোর জন্যে এতো কাণ্ড, সে লোকটা হয়রান হয়ে অনেক আগেই কেটে পড়েছে।

॥ যা সঙ্গে আছে ॥

কাজেই, বোঝাবার জন্যে অমন বোঝা ঘাড়ে করা চলবে না। যা সব সময় সঙ্গে আছে, বয়ে বেড়ানোর হাঙ্গামা নেই, হারিয়ে ফেলার ভয় নেই—তেমন কিছু হলেই সুবিধে। তেমন জিনিস কী আছে ? আমাদের হাত, পা, চোখ, মুখ—এক কথায়, আমাদের শরীরটা। পৃথিবীর সবচেয়ে ভুলো লোকের পক্ষেও নিজের একখানা হাত, কিংবা একটা ঠ্যাং ভুলে ফেলে আসা সম্ভব নয়। তুমি যেখানেই যাও, শরীরটা সঙ্গে যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জানাবার সবচেয়ে ভালো উপায় শরীরটাই আমাদের জুটিয়ে দিতে পারে। তোমাকে হাত দিয়ে বক দেখিয়ে দিতে পারি। বুড়ো আঙুল দিয়ে কলা দেখাতে পারি। ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিতে পারি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। এক কথায়, অঙ্গভঙ্গি করে জানাতে পারি। পাহাড় বোঝাবার জন্যে পাথরের নুড়ির বদলে হাত মুঠো করে দেখিয়ে দিলেই চলে।

কিন্তু মনে করো, তুমি আছো পাশের ঘরে। তোমাকে আমার দরকার। যদি হাত নেড়ে ইশারা করি, তুমি জানতেই পারবে না। অথচ হাততালি দিলে তুমি পাশের ঘর থেকেও শুনতে পাবে। তার মানে, ইশারার চেয়ে আওয়াজ করতে পারলে সুবিধে অনেক বেশি।

।। হাতে নয়, মুখে ।।

জানাবার জিনিস যে কত আছে, তার ইয়ত্তা নেই। তার জন্যে তেমনি রকমারি আওয়াজ দরকার। হাততালি দিয়ে তুমি ক'রকমের আওয়াজ করতে পারো? চেষ্টা করে দেখো তো? নিশ্চয় বেশি নয়। তাছাড়া ধরো, এক হাতে চায়ের কাপ ধরে আমাকে তুমি জিগ্যেস করতে চাও, 'চা খাবেন?' প্রশ্নটা ঐ অবস্থায় হাততালি দিয়ে জানাতে গেলে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াবে, ভাবো তো?

তাহলে এখন উপায়? জানাবার উপায়টা মানুষের হাতে নেই। উপায়টা আছে মানুষের মুখে।

ফুসফুসের হাওয়াটাকে গলা, জিভ, টাকরা, দাঁত, ঠোঁট—মুখের ভেতর নানা জায়গায় খেলিয়ে মানুষ যত রকমের খুশি আওয়াজ করতে পারে। হাত জোড়া থাকলেও মুখে আওয়াজ করতে কোনোই বাধা নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইশারা করার চেয়ে আওয়াজ করলে সব দিক থেকেই জানাবার সুবিধে। আওয়াজ করে জানাবার নামই হলো ভাষা।

টাপুর টুপুর শব্দ শুনেই ঘরে বসে বুঝলাম বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। টাপুর টুপুর শব্দটা কি বৃষ্টির ভাষা? না। ঢিপ্ করে শব্দ হতেই বুঝলাম, তাল পড়লো। ঢিপ্ শব্দটা কি তালের ভাষা? না। আওয়াজ হলেই ভাষা হয় না, জানাবার জন্যে আওয়াজ করলে তবেই ভাষা হয়। আওয়াজ হওয়া আর আওয়াজ করার মধ্যে তফাত আছে।

পশুপাখিরাও তো আওয়াজ করে জানায়। বাছুরকে দেখতে না পেলে গোরু চিৎকার করে ডাকে; কাক তার দলের সঙ্গীদের ডেকে ডেকে জড়ো করে। তাহলে কি বলবো, পশুপাখিদের ভাষা আছে?

॥ ভাব আর ভাষা ॥

না। পশুপাখিদের ডাক আছে, ভাষা নেই। ওদের আওয়াজগুলো অস্ফুট, ছাড়া-ছাড়া আওয়াজ। যেমন : 'ঘেউ-ঘেউ', 'কা-কা', 'হাম্-বা', 'ব্যা-ব্যা'। যেমন, আমরা ব্যথা লাগলে বলি 'উঃ', ভালো লাগলে বলি 'বাঃ', লজ্জা পেলে বলি 'ধ্যেৎ'।

মানুষ যদি 'উঃ-আঃ-বাঃ-ইস্-ছিঃ-ধ্যেৎ' ছাড়া কিছু বলতে না পারতো, তাহলে কিছুতেই এ কথা বলা যেতো না যে, মানুষের ভাষা আছে। নানা রকমের আওয়াজ একসঙ্গে গেঁথে স্পষ্ট ভাব স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলাই হলো ভাষার কাজ।

তোমাদের বাড়িতে কেউ গেলে তোমাদের কুকুরটা বলতেই পারবে না : 'কাকে চাই ?' কিন্তু তোমাদের যদি তোতাপাখি থাকতো, সে হুবহু মানুষের গলায় বলে উঠতো : 'কাকে চাই ?' শেখালে আরও অনেক কথাই সে বলতে পারে। তাহলে কি বলবো, তোতাপাখির ভাষা আছে ?

না। তোতাপাখি হুবহু মানুষের ভাষা নকল করতে পারে। তাই সেই নকল-করা বুলিটা তার ভাষা নয়। প্রত্যেকটা কথার ঠিকঠাক মানে তার জানা নেই। তাই তোতাপাখি কথা বলে না, শেখানো বুলি আওড়ায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কথা বলার যন্ত্র থাকলেই হলো না। যন্ত্রটাকে কাজে লাগালে তবেই তা থেকে ভাষা হয়।

॥ কথা আর কাজ ॥

কাজ করবার মুরোদ একমাত্র মানুষেরই আছে। মানুষই শুধু পেরেছে বাইরের জগৎটাকে নিজের দখলে আনতে। তার জন্যে হাত আর মাথার মধ্যে মিল থাকা দরকার। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একা এঁটে ওঠা কখনই সম্ভব নয় ; তাই মানুষকে দল বেঁধে লড়তে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে এই দল পাকিয়ে লড়াই করার নামই হলো কাজ করা।

মিলে মিশে কাজ করার জন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই নাম সমাজ। তার জন্যে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা দরকার, মন-জানাজানি হওয়া দরকার। নইলে কোনো কাজই করা যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, বোঝানো আর জানানোর কাজটা সবচেয়ে ভালো হয় মুখে বললে। সমাজের কাজে লাগবে বলেই ভাষার দরকার পড়েছে। সমাজ যদি না থাকতো ভাষা থাকতো না। তেমনি ভাষা যদি না থাকতো সমাজ গড়া সম্ভবই হতো না। কাজের সঙ্গে কথা, কথার সঙ্গে কাজ—একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা

করা যায় না। কথা ছাড়া কাজ এগোয় না ;' তেমনি কাজে না লাগলে কথা হয় শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজ।

॥ ভাষার মালমশলা ॥

বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন মালমশলার দরকার হয়, তেমনি ভাষার মালমশলা হলো শব্দ বা কথা। কথা ছাড়া ভাষা হয় না। তেমনি রকমারি আওয়াজ একসঙ্গে জুড়ে তৈরি হয় একেকটি শব্দ বা কথা। 'প' 'আ' 'হ্' 'আ' 'ড়'—এতোগুলো আলাদা আলাদা আওয়াজ একসঙ্গে গেঁথে তৈরি হলো একটি শব্দ—'পাহাড়'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাহাড় বোঝাতে গেলে 'পাহাড়' কথাটুকুই যথেষ্ট। বস্তু কিংবা ভাব—যাই বোঝাতে চাই না কেন, শব্দ দিয়েই তা বোঝানো যায়। শব্দ করে বলতে সময়ও লাগে খুব কম। আস্তে কথা বললেও সেকেণ্ডে কম করে চোদ্দটা আওয়াজ করা যায়।

রকমারি আওয়াজ জুড়লেই কি শব্দ হবে ? ধরো, আমি বললাম : 'রহাব্যব' কিংবা 'শেত্বষবি'। কিছু বোঝা গেলো ? কিছুই বোঝা গেলো না। কিন্তু ঐ আওয়াজগুলোকেই অন্যভাবে সাজিয়ে যখন বললাম 'ব্যবহার' কিংবা 'বিশেষত্ব', তখনই সেগুলো হলো শব্দ—কেননা কথাগুলোর মানে আছে। মানে থাকলে তবেই হবে শব্দ।

একটা ভাষায় যেটা শব্দ, অন্য ভাষায় সেটা শব্দ নাও হতে পারে। যেমন, ইংরেজীতে 'কারেজ' একটা শব্দ—বাংলায় ওটা শব্দই নয়। আবার তেমনি 'গান' শব্দটা ইংরেজীতেও আছে, বাংলাতেও আছে। কিন্তু দুটোর মানে একদম আলাদা। ইংরিজি 'গান্'-এর আওয়াজ হলে লোকে ছুটে পালায়, কিন্তু বাংলা 'গান' শুনবার জন্যে লোকে ছুটে আসে।

॥ জানার উপায় ॥

শব্দের কাজই হলো কোনো কিছু বলে দেওয়া। বাইরের জগৎটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একেবারে গোড়ার যুগে মানুষের কাছে প্রকৃতির ধরনধারন ছিলো একদম অচেনা। প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে গিয়ে মানুষ অনেক কিছু জানতে পেরেছে। প্রকৃতির কিছু জিনিস নড়ে যেমন : পশু-পাখি-মানুষ ; কিছু জিনিস নড়তে পারে না, যেমন : পাথর-মাটি-ভাঙা গাছের ডাল। কিছু জিনিস শক্ত, যেমন : পাথর ; কিছু জিনিস নরম, যেমন : কাদা, মাটি।

তার মানে, বিশ্বপ্রকৃতিকে একাকার করে দেখা নয়—তার মধ্যেকার আলাদা

আলাদা বস্তুগুলোকে খুঁটিয়ে দেখা, তাদের ভাবগতিকগুলো লক্ষ্য করা। ধরো, একটা বনের মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকেই ধাঁধা লেগে গেলো। তাকিয়ে দেখলাম, সার বেঁধে কী সব যেন অচল অবস্থায় মাটি ফুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম দেখতে যারা, অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করে তাদের এক কোঠায় ফেলে নাম দিলাম 'গাছ'। এবার আরও খুঁটিয়ে দেখলাম—সব গাছ এক নয়। যে-সব গাছ এক জাতের, তাদের অন্য সব গাছ থেকে আলাদা করে একেক কোঠায় ফেলে নাম দিলাম 'শাল' 'তাল' 'বট' 'অশথ'।

॥ শব্দ দিয়ে চেনা ॥

বাছাই করা আর সাজানো—চেনবার আর জানবার এই হলো উপায়। শুধু যদি বেছে বেছে গাছ দেখি, তাহলে বন দেখতে পাবো না ; আলাদা আলাদা গাছ এক জায়গায় মেলালে তবেই বনটাকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু জানা কিংবা চেনা মানেই হলো বাদবাকিদের থেকে আলাদা করা। যাতে অন্য সব কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে না যায়, তার জন্যে যেটাকে চিনছি, সেটার গায়ে আলাদা একটা লেবেল আঁটা দরকার। কিন্তু ধারণার গায়ে তো লেবেল আঁটা যায় না। কাজেই নাম দিয়ে লেবেল আঁটার কাজটা দিব্যি চালিয়ে নেওয়া যায়। নামটাই হবে বস্তু কিংবা ভাবের চিহ্ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চিনতে গেলে নাম দিতে হয়। নামটাই চিনিয়ে দেয়। এই নামটাই হলো শব্দ। শব্দের দৌলতেই আমরা জগৎটাকে চিনি। শব্দ ছাড়া ভাবাই যায় না।

॥ শব্দের দিগ্বিজয় ॥

শুধু বস্তু নয়, বস্তুর ভাবগতিকগুলো চিনতে গেলেও নামের দরকার। মানুষ ছুটছে, কুকুর ছুটছে, ঘোড়া ছুটছে—এ থেকে ছোটার ভাবগুলো, মানুষ-কুকুর-ঘোড়া থেকে আলাদা করে নিয়ে একটা কোঠায় ফেলে নাম দিলাম 'ছোটা'।

শুধু বস্তুকে জানলেই হবে না, তার গুণগুলো জানাও দরকার। কোন বস্তু, কটা বস্তু, পুরুষ না স্ত্রী, কী অবস্থায় আছে—শব্দ দিয়েই তা বোঝানো যায়।

পৃথিবীতে বস্তু আছে অসংখ্য, তার ভাবও তেমনি অসংখ্য। প্রত্যেকটার জন্যে যদি আলাদা আলাদা শব্দ ঠিক করতে হতো, তাহলে শব্দের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকতো না। যেমন ধরো, লাল কুকুর, কালো কুকুর, ছোট কুকুর, বড় কুকুর, শুয়ে-থাকা কুকুর, বসে-থাকা কুকুর—প্রত্যেকটার জন্যে যদি আলাদা শব্দের দরকার হতো, তাহলে কী মুশকিলে পড়তে বলো তো? লালই হোক, কালোই হোক, ছোটই হোক, বড়ই হোক, শুয়েই থাক আর বসেই থাক—

কুকুর ছাড়া তো কিছু নয়। কাজেই 'কুকুরে'র সঙ্গে লাল, কালো, ছোট, বড়, শুয়ে-থাকা, বসে-থাকা যোগ করে অনেক রকম ভাব বুঝিয়ে দেওয়া গেলো। ফলে, কম শব্দ দিয়ে অনেক রকমের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। এমনিভাবে গোটা দুনিয়াটাকে হাজার কয়েক শব্দের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ভরে ফেলা যায়।

॥ শব্দের গোড়ায় ॥

তাই সব ভাষাতেই শব্দের একটা মোটামুটি ধরাবাঁধা সংখ্যা থাকে। তারই ফলে, ভাষা শেখা সম্ভব হয়।

শব্দগুলো এলো কোথা থেকে? একেবারে গোড়ার যুগের মানুষ হয়তো পশুপাখির আওয়াজ নকল করে শব্দ গড়েছিলো! কাক শব্দটা হয়তো কা-কা ডাক নকল করেই এসেছে, ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজ নকল করেই হয়তো ঝিঁঝিঁ পোকা নামটা এসেছে। ছোট ছেলেরা যেমন বেড়ালের নাম দেয় 'ম্যাও', কুকুরকে বলে 'ঘেউ-ঘেউ', শেয়ালকে বলে 'হুক্কা-হুয়া'।

কিন্তু এই ধরনের আওয়াজ-নকল-করা শব্দ ভাষার মধ্যে খুবই কম থাকে। বেশির ভাগ শব্দই মানুষ দরকারমতো তৈরি করে নিয়েছে। সমাজের সবাই সেই শব্দগুলোকে মেনে নিলে তবেই সেগুলো ভাষার মধ্যে জায়গা পায়।

কতকগুলো শব্দ আছে, যেগুলো হলো ভাষার বনিয়াদ। এই শব্দগুলোকে ভর করে নতুন নতুন শব্দ গড়ে তোলা হয়। এগুলোকে বলা হয় শব্দের মূল-ধাতু। প্রত্যেকটা মূল-ধাতুই কোনো-না-কোনো ক্রিয়া বোঝায়। কথা কিভাবে কাজ থেকে এসেছে এই মূল-ধাতুগুলো পরখ করে দেখলেই বোঝা যায়।

॥ কাজ থেকে কথা ॥

মূল-ধাতুগুলো দিয়ে যে-সব কাজ বোঝানো হয়, তার প্রত্যেকটাই সমাজের কোনো-না-কোনো উৎপাদনের কাজ। এই কাজগুলো থেকে নতুন নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বহু শব্দের মধ্যেই তার ছাপ পাওয়া যায়।

যেমন 'বেত্র' কথাটার পেছনে আছে সংস্কৃতের একটি মূল-ধাতু 'বে'। 'বে' ধাতুর মানে, বয়ন করা বা বোনা। আদিমকালে গাছের ডালের মধ্যে ডাল গলিয়ে দিয়ে ঘরের বেড়া আর চাল বোনা হতো। পরে মানুষ আরও এগিয়ে গেলো। কাপড় বুনতে লাগলো, সুতো কাটতে লাগলো, সেলাই করতে লাগলো, পশমের জামা বুনতে লাগলো। এক রকমের কাজ থেকে আরও রকমারি কাজ দেখা দিলো।

'মৃ' মানে পিষে ফেলা, গুঁড়োনো, ঘষা, রেণু রেণু করা। এ থেকে তৈরি

হয়েছে নতুন নতুন শব্দ : মৃত্যু, মৃত, মর্ত্ত, মর্দন, মৃগ। একটু ভাবলেই কথাগুলোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

'বর্ণ' (রং) এসেছে 'বর্' থেকে। 'বর্' মানে ঢেকে দেওয়া। মূল-ধাতুগুলো শুধু সেই সেই কাজ এবং অবস্থার কথা বলে, মানুষ যা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, যার গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ পায়। আবার এইভাবে ধাতু দিয়েই তৈরি হয় এমন ভাব, যা শুধু ধারণার ব্যাপার। এমনিভাবে ভেজানো, ঘা দেওয়া, তেলানো, গলানো, নরম করা, মিল করা, খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি কাজের কথাগুলো দিয়ে অনেক রকম মনের ভাবই আমরা প্রকাশ করে থাকি। যেমন : মন ভেজানো, মন গলানো, ঘা দিয়ে বলা, হিংসেয় পোড়া।

'অশ' বলতে বোঝায় তীক্ষ্ণতা, দ্রুততা, চোখা ভাব। খুব দ্রুত ছোটে তাই ঘোড়ার নাম হলো 'অশ্ব'। ধারালো দৃষ্টির জন্যে চোখ হলো 'অক্ষি'। 'দর' বলতে বোঝায় ছেঁড়া কিংবা কাটা। চেরা হয় বা কাটা হয়, এই অর্থে গাছ হলো 'দ্রু' বা 'দারু'।

এমনিভাবেই মূল-ধাতুগুলোকে ভর করে তৈরি হয় নতুন নতুন শব্দ। সেই সঙ্গে অন্য সমাজের মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ভেতর দিয়ে অন্য ভাষা থেকেও আসে অনেক রকমারি শব্দ।

॥ ভোল বদল ॥

বাংলা শব্দ তাই দু-জাতের : মৌলিক আর আগন্তুক। মৌলিক শব্দগুলো এসেছে সংস্কৃত থেকে। কিন্তু তাদের চেহারা সব সময় এক থাকেনি। বেশির ভাগ শব্দই মুখে মুখে এমনভাবে বদলেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সংস্কৃতের বংশধর বলে চেনাই যায় না। যেমন : 'উপাধ্যায়' বদলাতে বদলাতে বাংলায় হয়ে গেছে 'ওঝা' এবং 'রোজা'; 'ইন্দ্রাগার' হয়েছে 'ইঁদারা', 'খাদ্য' হয়েছে 'খাজা'; 'অলাবু' হয়েছে 'লাউ'; 'বিস্ফোটক' হয়েছে 'বিষফোড়া'; 'টাকার কুবের' হয়েছে 'টাকার কুমির'। সংস্কৃতের মধ্যে যে-সব ভিন্ন বর্গের ভাষা ঢুকে পড়েছিলো, বাংলা ভাষায় সে-সব শব্দেরও ভোল বদলে গেছে। যেমন : গ্রীক 'দ্রাখ্মে' বাংলায় এসে হয়েছে 'দাম'; দ্রাবিড় 'কোড' হয়েছে বাঙলায় 'ঘড়া'।

সংস্কৃতের কতকগুলো শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে এসেও অবিকল এক আছে। যেমন : জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, অন্ন।

॥ দেশজ ও বিদেশী ॥

আগন্তুক শব্দগুলোর মধ্যে পড়ে : দেশজ এবং বিদেশী। এই দেশেরই

আদিবাসীদের ভাষায় যে-সব শব্দ ছিলো, সেইগুলোই হলো দেশজ। যেমন : ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ঝাঁটা, ঝোল, ঢিল, ঢেউ। এ-ছাড়া আছে বিদেশী শব্দ : যেমন ফরাসী থেকে এসেছে হাওয়া, লাল, জমি, আন্দাজ, খরচ, কম, বেশি, নগদ, খেয়াল। তুর্কী থেকে এসেছে আলখাল্লা, কাঁচি, কাবু, কুলি, বোঁচকা। পোতুগীজ থেকে এসেছে কাবার, আলপিন, আলকাতরা, নোনা, আলমারি, বালতি, বাসন, কেরানি, গুদাম, গীর্জা। ওলন্দাজ থেকে এসেছে হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ, ইস্ক্রুপ। ফারসী থেকে এসেছে কার্তুজ, কুপন, ওলন্দাজ। ইংরিজি থেকে এসেছে লাট, আপিস, লম্প, গেলাস, গারদ, সান্ত্রী, টিকিট, ইষ্টিশান, টেবিল, চেয়ার।

শুধু শব্দ নয়, বাংলা ভাষায় অনেক বিদেশী প্রত্যয়-উপসর্গেরও আমদানি হয়েছে। যেমন : ফারসী 'বে' (বেবন্দোবস্ত, বেহাত), 'ফি' (ফি-হপ্তা, ফি-বছর) এবং ইংরিজি 'হাফ' (হাফ-আখড়াই, হাফ-হাতা), 'ফুল' (ফুল-মোজা, ফুল-হাতা), 'হেড' (হেড-পণ্ডিত, হেড-মিস্ত্রি) যোগ করে। কথার শেষে ফারসী 'আনা' (বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা), 'গিরি' (কেরানিগিরি, বাবুগিরি) 'দার' (অংশীদার, বাজনদার), 'বাজ' (মতলববাজ, যুদ্ধবাজ), 'সই' (টেঁকসই, জুতসই) যোগ করে।

॥ অর্থের বদল ॥

ভাষার মধ্যে যেমন নতুন নতুন শব্দ এসে জমা হয়, তেমনি আবার অনেক পুরনো শব্দে নতুন নতুন অর্থ দেখা দেয়। যেমন, 'দারুণ' শব্দটা। গোড়ায় তার মানে ছিলো দারু বা কাঠের তৈরি ; পরে তার মানে হলো 'কাঠের তৈরি জিনিসের মতো কঠিন'। তারপর হলো 'অত্যন্ত কঠিন'। শেষ কালে 'কঠিন' বাদ গিয়ে হয়ে দাঁড়ালো 'অত্যন্ত'। ফলে, আজকাল আর আমাদের দারুণ ভালো লাগলো বলতে বাধে না। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন ইরানে 'দইব' শব্দের অর্থ ছিলো 'দেবতা' ; পরে তার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো 'দৈত্য, রাক্ষস'। তেমনি গ্রীক 'দেমন্' শব্দের অর্থ 'দেবতা' ; খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকদের কাছে তার মানে বদলে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো 'দৈত্য, রাক্ষস'। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষই দেবতাকে সৃষ্টি করে, আবার মানুষই তাকে ভাঙে।

যখন কেউ বলে তোমার অনেক গুণ আছে, শুনে নিশ্চয় খুশি হও। কিন্তু 'গুণ' কথাটার মূলে রয়েছে যে 'গো' শব্দটা, তার মানে কিন্তু গরু। এখন কেউ গুণের কথা তুললে নিশ্চয় তোমার রাগ হবে। কিন্তু রাগ করে লাভ নেই। গরুর কাছ থেকে এলেও 'গুণ' আজ 'গরু'র সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখে না।

ভাষা তৈরির মালমশলা হলো এই ধরনের সব রকমারি শব্দ। তাহলে শব্দগুলোকে পাশাপাশি বসালেই কি ভাষা তৈরি হয়ে যাবে?

॥ সম্পর্ক পাতানো ॥

ধরো, আমি পরপর কতকগুলো শব্দ বসিয়ে গেলাম : ঢেঁকিরে নাহি কত মানে, ধান বুঝাব বুঝাব ভানে অবুঝে নিত্য বুঝ কত'। কিছু বুঝতে পারলে? শুনে নিশ্চয় হাসি পাচ্ছে।

আচ্ছা, এবার ঐ কথাগুলোকেই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছি : 'অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।' এবার নিশ্চয় বোঝা গেলো? তাই বলে মনে কোরো না আমি তোমাকে ঢেঁকি বলছি।

সাজানো মানেই হলো আলাদা আলাদা জিনিসের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক পাতানো। শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক পাতালে হয় বাক্য। আমি যদি তোমাকে বলি : 'আমাকে তোমার লাল পেন্সিলটা দাও', বলা মানেই সম্পর্কে আসা। কিন্তু তোমার সঙ্গে সম্পর্কে আসতে গেলে আগে 'আমি' 'তুমি' 'পেন্সিল, 'লাল' 'দেওয়া'—এই আলাদা আলাদা কথাগুলোর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক পাতানো দরকার। শব্দগুলো কী নিয়মে পাশাপাশি বসবে, ব্যাকরণই তা ঠিক করে দেয়। ভাব প্রকাশ করতে গেলে শব্দগুলোকে ব্যাকরণের শাসন মেনে চলতে হয়। ব্যাকরণ হলো ভাষার লাগাম।

পৃথিবীর সব মানুষ একই ভাষায় কথা বলে না। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার তফাত শুধু শব্দের দিক থেকেই নয়। শব্দগুলোকে বাঁধবার নিয়মের দিক থেকেও তফাত থাকে। ইংরিজিতে 'আমাকে তোমার লাল পেন্সিলটা দাও' বলা যাবে না; বলতে হবে 'দাও আমাকে তোমার লাল পেন্সিলটা'।

॥ ভাষার আত্মীয়তা ॥

শব্দ আর ব্যাকরণের দিক থেকে ভাষার সঙ্গে ভাষার যেমন তফাত আছে, তেমনি আবার অনেক মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। যেসব পুরনো ভাষা থেকে আজকালকার ভাষাগুলো তৈরি হয়েছে সেইসব পুরনো ভাষাগুলোর মধ্যে আত্মীয়তা বিচার করে তাদের একেকটি গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা হয়েছে।

এর নাম ভাষার বংশ-পরিচয়। সংস্কৃত, আবেস্তীয়, লাতিন, আর্মানীয়, প্রাচীন ফারসী, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন শ্লাবিক, প্রাচীন কেল্‌তিক, প্রাচীন জার্মানিক—এই ভাষাগুলোকে একটি গোষ্ঠীতে ফেলে নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি ভাষা-গোষ্ঠী আছে : সেমীয়-হামীয়, বাণ্ট,

ফিন্নো-উগ্রীয়, তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু, ককেশীয়, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, ভোট-চীনীয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, এস্‌কিমো আর আমেরিকার বিভিন্ন আদিম ভাষা-গোষ্ঠী।

কিছু পুরনো ভাষাকে কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায়নি : মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয়, পশ্চিম ইরানের শুশা অঞ্চলের ভাষা এলামীয়, পূর্ব মেসোপটেমিয়ার অঞ্চল-বিশেষের ভাষা মিতান্নি, ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাষা, ইতালির প্রাচীন ভাষা এত্রুস্কান। কিছু আধুনিক ভাষাকেও তেমনি কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায় না : ফ্রান্স ও মধ্যবর্তী পীরেনীজ পর্বতমালার পশ্চিমাংশের বাস্ক্, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুশ্‌মান আর হটেন্‌টট, জাপানী, কোরিয়ান এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা।

॥ মিল আর অমিল ॥

এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার এই মিল দেখে আঁচ করা যায়, কোনো একটা সময়ে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। মাদাগাস্কারের ভাষার সঙ্গে মালয়ের ভাষার যে মিল, তা থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় কোনো একটা সময়ে মাদাগাস্কারের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ছিলো।

তাই বলে কোনো একটা লক্ষণ মিলে গেলেই একথা বলা যায় না যে, দুটো ভাষার মধ্যে নিশ্চয়ই যোগ ছিলো। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লিঙ্গের তফাত করা হয়, তেমনি আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগের ভাষাতেও লিঙ্গভেদ আছে। আলাদা-আলাদা ভাবে গড়ে উঠলেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোনো কোনো লক্ষণের মিল থাকতে পারে। সেইজন্যেই এটা কিছুতেই ধরে নেওয়া যায় না যে, সব ভাষাই গোড়াতে এক ভাষা ছিলো।

॥ জীবনের ছাপ ॥

ভাষার মধ্যে অনেক অতীত ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় 'উজবুক' বলে একটা কথা আছে। কথাটা এসেছে 'উজবেক' থেকে। মধ্যযুগে উজবেকিস্থানের কিছু লোক বাংলা দেশে এসেছিলেন। তার স্মৃতি 'উজবুক' কথাটার মধ্যে থেকে গেছে।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষের জীবনের ধরনধারন এবং ধ্যানধারণা কী রকমের ছিলো, ভাষার মধ্যেই তার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের ভাষায় 'গো' কথাটার ছড়াছড়ি—'গোত্র' থেকে শুরু করে 'গুন', সব-কিছুর মধ্যেই গরু বিরাজ করছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, এককালে এ দেশের সমাজে পশুপালনের প্রাধান্য ছিলো। 'তোমাকে গরু-খোঁজা করে খুঁজছিলাম'—এ

কথা বললে নিশ্চয়ই তুমি রাগ করো না। কিন্তু যে সত্যিই গরু খুঁজছে, তার কাজটাকে আজও যদি 'গবেষণা' বলে চালানো হয়—তা হলে একালের গবেষণাকারী পণ্ডিতরা নিশ্চয়ই খুশি হবেন না।

ভাষা যেমন সমাজকে ধরে রাখে, মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়—তেমনি আবার ভাষার ওপর ভর করে সমাজও এগিয়ে যায়। সমাজের ওপর ভাষা ছাপ ফেলে।

হাতের লেখা

দিন দশেক বাদে আমাদের বাড়িতে বিরাট একটি ভোজ হবে। খুব খুশি হবো তুমি এলে। কিন্তু মনে করো, তোমার এমনই দশা যে, পেটে বোমা মারলেও 'ক' বেরোয় না। তোমার কাছে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠানো বৃথা। তাই তোমাকে দশটা গেরো-বাঁধা একটি দড়ি পাঠিয়ে বলে দিলাম, রোজ একটা করে গেরো খুলতে। যেদিন গেরো খোলবার পর দেখবে দড়িতে আর একটাও গেরো নেই, সেদিন সটান নেমন্তন্ন-বাড়ি গিয়ে হাজির হবে।

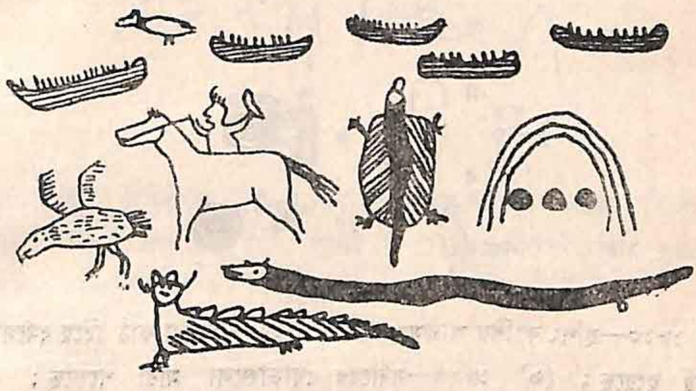
॥ চিহ্ন দেওয়া ॥

নেমন্তন্নর কথা থাক। মনে করো, তুমি আর আমি এক জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে শিকার করতে গিয়েছি। হঠাৎ কোনো দরকারে আমাকে একবার এক সপ্তাহের জন্যে শহরে যেতে হলো। যাবার সময় তোমাকে আমি বলে গেলাম, তুমি এখানে থাকবে ; আমি ফিরে আসবার আগে যদি তুমি কোথাও চলে যাও, বিস্তারিতভাবে জানিয়ে যাবে এর মধ্যে এদিকে আর কোনো শিকারীর দল এসেছে কিনা। সকালে গিয়ে বিকেলের মধ্যেই কিন্তু তাঁবুতে ফিরে এসো। শহর থেকে ফিরে এসে দেখলাম তুমি নেই। তাঁবুর সামনে মাটিতে চারটে কাঠি পোঁতা রয়েছে। কাঠিগুলো দক্ষিণ দিকে হেলানো। তার পাশে গাছের একটা ভাঙা বড় ডাল পুব আকাশের দিকে নিশানা করা। কাছেই পড়ে আছে পাঁচটা টাটকা সবুজ পাতা। সেই সঙ্গে আছে ঘোড়ার ল্যাজের ছটা চুল ; ল্যাজের দুটি চুল দিয়ে হরিণের গায়ের একগোছা লোম জড়ানো।

তা থেকে কী বুঝবো ?—চারজন শিকারীর একটি দলকে পাঁচ দিন আগে সকাল বেলায় দক্ষিণ দিকে যেতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে ছিলো ছটি ঘোড়া। ছটি ঘোড়ার ওপর চাপিয়ে তারা হরিণের মাংস নিয়ে গেছে।

লিখে জানানোর বদলে এইভাবে কতকগুলো চিহ্ন দিয়ে জানাবার রীতি আজও আমেরিকার কোনো কোনো আদিবাসীদের মধ্যে আছে। এই সব চিহ্নগুলো যাদের জানা নেই, তারা কিন্তু চিহ্নগুলোর কোনো মানেই খুঁজে পাবে না।

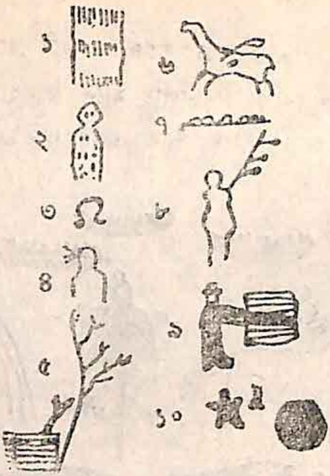
তার চেয়ে ছবি এঁকে জানানো ঢের সহজ। ছবি দেখে যে-কেউ বুঝে নিতে পারে। তার জন্যে আগে থেকে চিহ্নগুলোর মানে জানবার দরকার হয় না। নিচে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের আঁকা একটা ছবি দেখো :



ছবিতে একটা স্মরণীয় ঘটনার কথা বলা হয়েছে। জলপথে যাত্রা করেছিলো পাঁচটা ডিঙি। প্রথমটায় লোক ছিলো ষোলো জন, দ্বিতীয়টায় ন জন, তৃতীয়টায় দশ জন, চতুর্থ আর পঞ্চম ডিঙিতে আট জন করে লোক ছিলো। যতগুলো লোক, ততগুলো দাগ। সকলের আগের ডিঙির সর্দার 'মাছরাঙা' দলের লোক; তাই ডিঙির মাথায় মাছরাঙার ছবি। তিন দিন সময় লেগেছিলো—ধনুকের মতো তিনটে দাগের কোলে তিনটে ফুটকি দিয়ে তিনদিনের সূর্য বোঝানো হয়েছে। ঘোড়সওয়ারটি হলো দলের জাদু-জানা লোক। সেও সঙ্গে গিয়েছিলো। কাছিম এঁকে বোঝানো হয়েছে যে, তারা নিরাপদে ডাঙায় পৌঁচেছিলো। বাঁ দিকের ঈগল পাখিটা হলো সাহসের লক্ষণ; নিচেকার আজগুবি প্রাণীগুলো দলটার সহায় ছিলো। অবশ্য ছবি দিয়ে বোঝানো হলেও প্রত্যেকটা ছবির মানে খুব স্পষ্ট নয়। ঘোড়ায়-চড়া লোকটা নৌকোর যাত্রীদের সঙ্গী হলো কেমন করে বোঝা যায় না।

এমনি আরও একটি ছবি দেখো :

১৮০০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের বর্ষপঞ্জী। ছবির মধ্যে ধরা পড়েছে গোষ্ঠীর জীবনে প্রত্যেকটি বছরের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। নম্বর মিলিয়ে দেখো : (১) ১৮০০—দলের তিরিশ জন অন্য দলের হাতে খুন হয়েছে; (২) ১৮০১—বসন্তের মড়ক; (৩) ১৮০২—নাললাগানো ঘোড়া চুরি গেছে;



(৪) ১৮১৩—হুপিং কাশির আক্রমণ ; (৫) ১৮১৭—শুকনো কাঠ দিয়ে ধর্মগোলা তৈরি হয়েছে ; (৬) ১৮২৪—সর্দারের ঘোড়াগুলো মারা পড়েছে ; (৭) ১৮২৫—বানের জলে লোক ভেসে গেছে ; (৮) ১৮৪৮—ঋজুপৃষ্ঠ নামে একজন বর্শার ফলকে খুন হয়েছে ; (৯) ১৮৫৩—স্পেনদেশ থেকে কম্বলের আমদানি হয়েছে ; (১০) ১৮৬৯—পূর্ণ সূর্যগ্রহন।

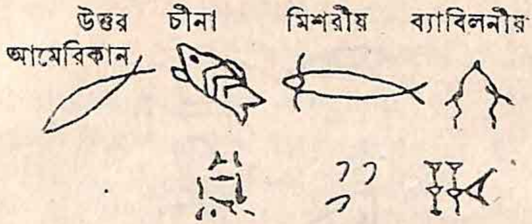
॥ ছবি লেখা ॥

কিন্তু ছবি এঁকে বোঝাতে গেলেও অসুবিধে আছে। একজন লোক মাছ ধরে রান্না করে খেলো : এটা বোঝাতে তিনবার তিন রকমের ভঙ্গিতে মানুষ আঁকতে হবে। তেমনি যদি ছবি এঁকে বোঝাতে হয় : সমুদ্রে নৌকোর মধ্যে বসে আছে একদল লোক—তাহলে দেখাতে হবে সমুদ্রের মধ্যে একটা নৌকো, নৌকোর মধ্যে একদল লোক। ছবিতে নৌকো, জল আর একদল মানুষ একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করে দেখানো যাবে না।

কিন্তু যখন ছবি আঁকা হচ্ছে না, ছবিকে লেখার কাজে লাগানো হচ্ছে—তখন ধরা, রাঁধা, খাওয়া থেকে মানুষকে আলাদা না করে উপায় নেই। শুধু মানুষের একটা ছবি থাকবে। ছবিটা দেখলেই লোকে বুঝবে 'মানুষ'। সে কি করছে না করছে—তা দেখবার দরকার নেই। তেমনি মাছের একটি ছবি থাকবে। ছবিটা দেখলেই লোকে বুঝবে 'মাছ'।

তার মানে এ নয় যে, অবিকল একটি মাছ আঁকতে হবে। সংক্ষেপে এঁকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হলো। সংক্ষেপে মাছের রূপটা কী হবে, সেটাও বেঁধে

দেওয়া দরকার, নইলে যে যার খুশিমতো মাছ আঁকবে। তাতে বোঝাবার অসুবিধে হবে। বিভিন্ন দেশে ছক-বাঁধা মাছের ছবি কিভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখো :

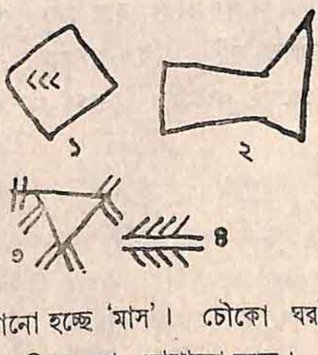


প্রথম লাইনে ছবিগুলো হচ্ছে একেবারে আদিম যুগের। মাছের ধাঁচটা ছবির মধ্যে স্পষ্ট ; পরে সেই ছবি লেখায় যে চেহারা নিয়েছে, তার সঙ্গে মাছের কোনো মিল খুজে পাওয়া যায় না।

॥ ধারণার ছবি ॥

মানুষ, মাছ—এসব তো চোখে দেখা যায়। কাজেই আঁকার মুশকিল নেই। কিন্তু যা চোখে দেখা যায় না, যার চেহারা নেই—তার ছবি হবে কেমন করে? যেমন : ধরা, বাঁধা, খাওয়া, সরু, মোটা, শক্ত, নরম, ভবিষ্যৎ, ভাগ্য—কোনোটা কাজ, কোনোটা গুণ, কোনোটা ধারণা। এদের আলাদা কোনো চেহারা নেই। কাজেই ছবি দিয়ে এইসব ভাব বোঝাতে গেলে, এদের একটা করে মন-গড়া চেহারা তৈরি করে নিতে হবে।

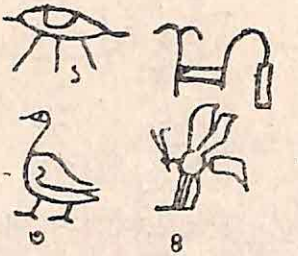
আজ থেকে হাজার চারেক বছর আগে মেসোপোটেমিয়ায় এই ধরনের ভাব ছবি দিয়ে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হতো দেখো :



১ নং ছবিতে বোঝানো হচ্ছে 'মাস'। চৌকো ঘরটা হলো সূর্য ; তার ভেতরে একেকটি দাগ দিয়ে দশ বোঝানো হচ্ছে। কাজেই গোটা ছবিটার মানে হলো তিরিশ দিন। ২ নং ছবিতে একটি পা দিয়ে 'দাঁড়ানো'র ভাব

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৩ নং ছবিতে 'চেরা' বা 'কাটা' বোঝানো হচ্ছে। ৪ নং ছবিতে বোঝানো হচ্ছে 'ভাগ্য'।

মিশরে কিভাবে ছবি দিয়ে বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলা হতো, নিচের ছবিতে দেখো :



১ নং ছবিতে চোখ থেকে জল পড়ছে ; অর্থাৎ 'কান্না' বোঝানো হচ্ছে। ২ নং ছবিতে একটি খাগের কলমের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা কালির দোয়াত, অর্থাৎ, 'লেখা' বোঝানো হচ্ছে। ৩ নং ছবিতে হাঁস দিয়ে 'শিশু', বিশেষ করে 'ছেলে' বোঝানো হচ্ছে ; সেকালে বাপমার কাছে ছেলের যে কতখানি কদর ছিলো, সুখাদ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৪ নং ছবিতে মৌমাছি দিয়ে 'রাজা' বোঝানো হয়েছে ; প্রাচীন মিশরে রাজারাজড়াদের লোকে কী চোখে দেখতো এই ছবি দেখে তা আঁচ করা যায়। রাজার ক্ষমতা এবং আধিপত্যকে সেকালের মিশরে বোধহয় বড় করে দেখা হতো না ; কারণ তা যদি হতো, তাহলে তারা বাঘসিংহের ছবি দিয়ে রাজা বোঝাতো। রাজাকে মৌমাছির সমান করে দেখার উদ্দেশ্য বোধহয় এখানে রাজার সংগঠনশক্তিকেই বড় করে দেখানো।

চীনদেশে লেখার ধরনে আজও ছবির ছাপ থেকে গেছে। এখনকার দাগ দেখে ধরাই যাবে না কিসের ছবি। কিন্তু দাগগুলোর মানে থেকে বোঝা যাবে কিভাবে সেগুলো ছবি থেকেই এসেছে। নিচে এই রকমের চারটে কথার লিখিত রূপ দেখো :



১ নং ছবির মানে 'সকাল' ; একটি সরল রেখার মাথায় চারকোণা 'সূর্য' ;

সূর্য উঠেছে দিগন্তে। ২ নং ছবির মানে 'শব্দ', 'কথা'; নিচে চৌকো ঘরটা হলো 'মুখে'র ছবি; ওপরের আড়াআড়ি দাগগুলো দিয়ে মুখ থেকে আওয়াজ বার করবার ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৩ নং জোড়া ছবিতে বোঝানো হচ্ছে 'সুখী'; প্রথম ছবিতে 'স্ত্রী' পরের ছবিতে 'সন্তান'; মার কাছে সন্তান—এ থেকে সুখের ধারণা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ৪ নং জোড়া ছবিতে মোকর্দমা বোঝানো হচ্ছে। ছবির তিনটে অংশ; প্রথম এবং শেষ অংশ—দুটোরই মানে 'কুকুর'; মাঝখানে ছোট করে আঁকা ২ নং ছবি—অর্থাৎ, 'কথা'। মামলা-মোকর্দমার ব্যাপারটা যেন দুটো কুকুরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ।

॥ ছবির সঙ্গে আওয়াজ ॥

এতক্ষণ কেবল নির্বাক্ ছবির কথাই বলা হলো। যতদিন ছবির সঙ্গে শব্দের কোনো সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি, ততদিন লেখা জিনিসটা ছিলো ভাষা থেকে আলাদা।

কিন্তু যে জিনিসটা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হতো, সেটা নিশ্চয় মুখের কথাতেও লোকে ফুটিয়ে তুলতো। যেমন, কোনো কথা জানাতে গেলে দুভাবে জানানো সম্ভব: (১) লিখে, অর্থাৎ ছবি এঁকে; (২) কথা বলে, অর্থাৎ শব্দ দিয়ে।

গোড়ায় ছবি আর আওয়াজ ছিলো আলাদা। ক্রমে ছবি দিয়ে আওয়াজ বোঝানো হতে লাগলো। যেমন, একটা বইয়ের ছবি আঁকলাম আর তার পাশেই আরেকটা ঘড়ির ছবি আঁকলাম। প্রথমটায় হলো 'বই', দ্বিতীয়টায় সময় অর্থে হলো 'কাল'। দুটো জুড়লে হবে পুঁথি আর সময় নয়—'বইকাল' অর্থাৎ 'বৈকাল'। এখানে দুটো ছবি দুটো শব্দ। দুটো শব্দ জুড়ে যে-মানে হচ্ছে, তার সঙ্গে ছবির কোনো সম্পর্ক নেই।

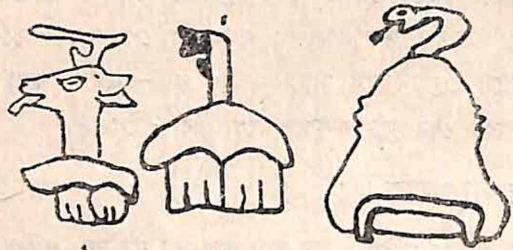
এমনিভাবে মিশরে সেকালে ছবি দিয়ে আওয়াজ বোঝানো হতো।



১ নং ছবিতে মুখ বোঝানো হচ্ছে। মুখকে বলা হতো 'র'। কাজেই 'র' শব্দটা বোঝাতে গেলে এমনি একটা ছবি আঁকলেই চলতো। ছবিটার আলাদা কোনো মানে আর থাকলো না; ওটা হয়ে দাঁড়ালো 'র' আওয়াজের ছবি। তেমনি ২ নং ছবিতে 'কান' বোঝালেও মিশরীয় ভাষায় যেহেতু কানকে বলা হতো স্‌দম্ সেইজন্যে এই ছবিতে শুধুমাত্র 'স্‌দম্' আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। ৩ নং

ছবিটা 'বাবুই পাখি'র। বাবুই পাখি মিশরীয় ভাষায় হলো 'উর'। কাজেই এখানে ছবিতে 'উর' আওয়াজ বোঝানো হচ্ছে।

মেক্সিকোর আজ্‌টেকদের লেখায় আবার একটু তফাত দেখা যায়। নিচে তিনটে ছবি দেখো। তিনটেই হলো শহরের নাম।



১ ২ ৩

১ নং ও ২ নং—দুটোতেই ওপরকার অংশে হরিণের ছবি, নিচেকার অংশে দাঁতের ছবি। আজ্‌টেকরা হরিণকে বলে 'মাজাত্‌ল্', দাঁতকে বলে 'ৎলানংলি'। কিন্তু এই দুটো শব্দ আস্ত জুড়ে শহরের নাম হয়নি। প্রথম শব্দটা থেকে নেওয়া হয়েছে 'মাজা', তেমনি দ্বিতীয় শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে 'ৎলান্'; এই দুটো ভাঙা অংশ জুড়ে শহরের নাম পাওয়া গেলো মাজাৎলান। শহরের নাম দুভাবে লেখা হয়েছে। ৩ নং ছবিতে শহরের নাম 'কোয়াতেপেক' বোঝানো হয়েছে; সাপ হলো 'কোয়াৎল্'; সাপটার নিচে পাহাড়; পাহাড় হলো 'তেপেক'। প্রথম শব্দটাকে ভেঙে শুধু 'কোয়া' রাখা হলো; দ্বিতীয় শব্দটা থাকলো আস্ত।

।। লিপি পাঠ ।।

মানুষের সভ্যতার একটি চিহ্ন হলো লিখতে শেখা। মনের ভাব লেখার মধ্যে ধরে রাখা। তারই জোরে মানুষ আজ এতখানি এগোতে পেরেছে।

লেখা এগিয়েছে ধাপে ধাপে। আগে ছিলো ছবি, পরে হলো হরফ। দুটোর মধ্যে মিল কোথায়? দুটোর জন্যেই দাগ দেওয়া দরকার। দাগ না দিলে ছবিও হবে না, হরফও হবে না: তাহলে দাগগুলোর সূত্র ধরেই পাওয়া যাবে লেখার ইতিবৃত্ত।

পুরনো লেখার বিস্তর নমুনা পাওয়া গেছে ভূমধ্যসাগর এলাকায়—মিশরীয়, সুমেরীয়, হিটাইট ও ক্রীটান্ লিপি। এ ছাড়া পাওয়া গেছে সিন্ধু উপত্যকায়, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরের ঈস্টার দ্বীপে, মেক্সিকোয় ও মধ্য আমেরিকায়।

মনে করো, কয়েক হাজার বছর আগের লেখার একটা নমুনা মাটি খুঁড়ে

পাওয়া গেলো। কিন্তু সে লেখা কী করে পড়া যাবে? পড়তে গেলে আগে এমন একটি শব্দ জেনে নিতে হবে, যা নিশ্চয়ই ঐ অজানা লিপিতে লেখা আছে। শব্দটা কোনো কিছুর নাম হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ, নাম জিনিসটা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গেলেও খুব বেশি বদলায় না। কিন্তু এই নাম কিভাবে পাওয়া যাবে? মিশরের পুরনো লেখা কিভাবে পড়া হয়েছিলো দেখা যাক।

মিশরের পুরনো লেখা অনেক আগে খুঁজে পেলেও অনেকদিন পর্যন্ত সে লেখা কেউ পড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ অন্য জায়গায় এমন একটা পাথর কুড়িয়ে পাওয়া গেলো, যাতে একই কথা একই সঙ্গে গ্রীক আর মিশরীয় লিপিতে লেখা আছে। তখন তা থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে মিশরের পুরনো লেখায় 'টলেমি' নামটা বার করা গেলো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একই কথা যদি দুটো ভাষায় লেখা থাকে একমাত্র তাহলেই অজানা লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব। এই উপায় না থাকার জন্যই পৃথিবীর অনেক পুরনো লিপির আজও পাঠোদ্ধার করা যায়নি। যেমন, ক্রীট্ কিংবা সিন্ধু উপত্যকার লিপি।

॥ হরফের আগে ॥

ক্রীট্-এর সবচেয়ে পুরনো লিপি প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার। তাতে ছবির সাহায্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে পরের দিকের এক ধরনের লিপি পাওয়া যায়—তাতে সোজা কিংবা বাঁকা দাগ দিয়ে লেখা হয়েছে। সোজা আর বাঁকা দাগগুলো দিয়ে যে নানা রকমের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

তিন থেকে চার হাজার বছর আগে এশিয়ায় হিটাইটদের বেশ দাপটই ছিলো। তাদের সঙ্গে যে আসীরীয় আর মিশরীয়দের লেনদেন ছিলো তার লিখিত প্রমাণ আছে। আসীরীয়দের কাছ থেকে তারা কোণাচে লেখার ধরন শিখেছিলো; তাদের নিজেদের লেখা বলতে ছিলো ছবি এঁকে ভাব প্রকাশ করা। ঐ ধরনের লেখা শুধু তারা স্মৃতিস্তম্ভের জন্যে পাথরে কিংবা ধাতুর ওপর লিখতো, কিন্তু আটপৌরে লেখা হিসেবে তারা কোণাচে ধাঁচের আসীরীয় লিপিই ব্যবহার করতো।

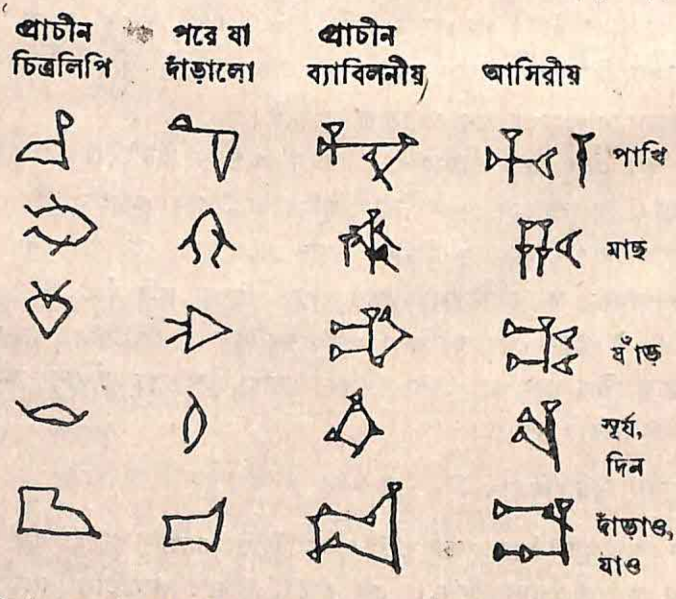
॥ কোণাচে লেখা ॥

হরফ হবার আগে মধ্য প্রাচ্যের বেশির ভাগ লিপির মধ্যেই পাওয়া যায় খুন্তির মতো কোণাচে ধাঁচের লেখা। এই ধাঁচটা আদতে এসেছিলো সুমেরীয়দের

কাছ থেকে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরীয়দের মধ্যে লেখার এই ধরনটা ছিলো। তারও আগে দুটো ধরনে লেখা হতো (১) পাথরের ওপর খোদাই করা চিত্রলিপি ; (২) মাটির ওপর বাঁকা-সোজা দাগ কেটে লেখা। মাটির ওপর দাগ কেটে ছবি আঁকা শক্ত ; তাতে সময়ও লাগে অনেক। তাই লেখার মধ্যে ছবির ভাব কমে আসতে লাগলো।

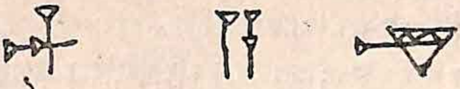
পরে মাটির ফলকে লেখা হলেও লেখার ধাঁচ গেলো খুন্তির মতো বদলে। কোণাচে ধরনের লেখা হতে লাগলো। তা থেকে ছবির ভাব বাদ গিয়ে সেগুলো ক্রমে শব্দের চিহ্ন হয়ে উঠলো। তাতে আরও সুবিধে হলো এই যে সহজে এবং তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব হলো। আজ যেমন কাগজে লেখা হয় তেমনি সেযুগে মাটির ওপরই লেখা হতো। লেখার জন্যে এক রকমের খাগের কলম ব্যবহার করা হতে লাগলো। লেখায় সেই জন্যেই কোণাচে ভাব ফুটে উঠলো। মাটির ওপর বাঁকা দাগ কাটা মুশকিল, তাই শুধু সোজা লাইনেই লেখা হতে লাগলো। মাটির ওপর এই লেখার নকল করে পরে পাথরের ওপরও কোণাচে ধাঁচের লেখা দেখা দিলো।

কিন্তু লেখায় ছবির ভাব যে একেবারে উঠে গেলো তা নয়। শব্দগুলোর মানে বেঁধে দেবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে ছবি জুড়ে দেওয়া হতে লাগলো। যেমন মৃত বোঝাবার জন্যে অনেক সময় আমরা নামের আগে একটা ছবি বা চিহ্ন জুড়ে দিই—'পিতার নাম ৺বটকৃষ্ণ নন্দী।' পড়বার সময় এই



চিহ্ন উচ্চারণ করবার দরকার হয় না, যেমন পড়বার সময় আমরা কমা কিংবা

দাঁড়ি উচ্চারণ করি না। সুমেরীয়দের লেখায় এই ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হতো দেবতা, মানুষ, দেশ, শহর, নদী, গাছ এবং পাহাড়ের নামের সঙ্গে। কেননা আমি যদি লিখি সরস্বতী—তাহলে তা দেবীর নামও হতে পারে, নদীর নামও হতে পারে আবার কোনো মেয়ের নামও হতে পারে। যাতে বুঝতে ভুল না হয় তারই জন্যে চিহ্ন দেওয়া।



১ ২ ৩



৪

১নং চিহ্ন হলো দেবতার, ২ নং লেখাটি দিয়ে 'অ' শব্দ বোঝানো হচ্ছে; ৩ নং লেখাটি দিয়ে 'সুর' শব্দ বোঝানো হচ্ছে। ৪ নং লেখায় দেবতাসূচক চিহ্নের পাশে আসীরীয় ধাঁচে 'অসুর' শব্দ লেখা হয়েছে। আসীরীয়দের কাছে 'অসুর' মানে কিন্তু 'দেবতা'।

॥ মিশ্র শব্দ ॥

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে চীনদেশে লেখার আবিষ্কার হয়েছিলো। হাড়ের ওপর লেখার সবচেয়ে পুরনো যে নমুনা পাওয়া গেছে, সেটা অবশ্য অতদিন আগেকার নয়। এই সব লেখা থেকে মনে হয়, অন্যান্য লিপির মতোই চীনদেশেও একই পথে লেখার বিকাশ হচ্ছিলো। ছবির জায়গায় ক্রমেই আওয়াজ এসে জুড়ে বসেছিলো।

কিন্তু চীনা ভাষাটাই এমন যে তাতে নানা ধরনের আওয়াজ দিয়ে বেশি সংখ্যক শব্দ তৈরি করা যায় না। ফলে, একই রকমের শব্দের একাধিক মানে থাকে। কাজেই ভিন্ন রকমের অর্থ বোঝাতে গেলে শব্দের সঙ্গে আলাদা আলাদা চিহ্ন জুড়ে দেবার দরকার হয়। আওয়াজের সঙ্গে এই ধরনের চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় মিশ্র শব্দ। চীনা ভাষায় শতকরা নব্বই ভাগই হলো এই ধরনের মিশ্র শব্দ।

যেমন 'ফ্যাং' একটা শব্দ। কিন্তু তার সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন জুড়লে উচ্চারণ ঠিকই থাকবে, কিন্তু মানে একদম বদলে যাবে। 'ফ্যাং' মানে 'চৌকো'। তার সঙ্গে মাটির চিহ্ন জুড়লেই 'ফ্যাং' মানে হয়ে যাবে 'রাস্তা'। তেমনি 'ফ্যাং' শব্দটার আগে 'কথা'র চিহ্ন দিলে তার মানে হবে 'খোঁজখবর নেওয়া'।

আবার 'স্ত্রী'র চিহ্ন 'ফ্যাং'-এর আগে জুড়লে তার মানে হবে 'বাধা দেওয়া'। চিহ্নগুলো বোবা, কিন্তু শব্দটা সরব। কাজেই 'ফ্যাং' বললে বোঝা মুশকিল। লিখলে তবেই মানেটা পরিষ্কার হবে।

চীনা ভাষায় শব্দের উচ্চারণ অনেক বদলে গেছে। কিন্তু লেখার দিক থেকে চেহারা একই আছে। যেমন বাংলায় লেখা হয় 'এক'—কিন্তু তার উচ্চারণ কেউ করে 'য়েক', কেউ করে 'অ্যাক'।

ফলে, উত্তর আর দক্ষিণ চীনের লোক যদি পরস্পরের মধ্যে কথা বলে, কেউ কারো কথা বুঝবে না। কিন্তু একজন যদি লেখে, তাহলে অন্যের তা বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

॥ মিশরীয় চিত্রাক্ষর ॥

মিশরীয় লেখার সবচেয়ে পুরনো যে নমুনা পাওয়া যায়, তা লেখা হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে। প্রথমে ছিলো নিছক ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া। স্মৃতিস্তম্ভ, কবর এবং ঘরবাড়ি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল রাখার জন্যে এবং ধর্মাচরণের জন্যে পাথর কিংবা কাঠের ওপর খোদাই করে লেখা হতো। কলম আর কালি দিয়ে কাগজের ওপরও কখনও কখনও লেখা হতো। কাগজ তৈরি হতো প্যাপিরাস্ গাছের পাতা থেকে।

আটপৌরে লেখায় ধরে ধরে সুন্দর করে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। কাজেই লেখার ছাঁদ ক্রমেই বদলে সহজ হতে লাগলো। ২৫ পৃষ্ঠায় মাছের ছবি মিশরীয় রীতিতে কিভাবে পরে সহজে সাঁটে লেখা হতে লাগলো তার নমুনা দেখতে পাবে।

ছবির সঙ্গে ক্রমে শব্দ জোড়া হতে লাগলো ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিহ্ন দিয়ে একেকটি ব্যঞ্জনবর্ণ ফুটিয়ে তোলা হলো। এই রকমের চব্বিশটা চিহ্ন তৈরি হয়েছিলো। মিশরীয়দের হাতে হরফ তৈরির এই মালমশলা মজুত থাকা সত্ত্বেও তারা ছবি, শব্দ আর পৃথক বর্ণের ব্যবহার একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলো।

হরফকে ইংরিজিতে বলে 'আল্‌ফাবেট'। কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। গ্রীক ভাষায় প্রথম দু অক্ষরের নাম 'আল্‌ফা' আর 'বেটা'। কিন্তু এই নাম দুটো তাদের নিজেদের নয়। গ্রীকরা সেমাইটদের কাছ থেকে নাম দুটো পেয়েছে। সেমাইটদের প্রথম দু অক্ষরের নাম 'আলেফ' আর 'বেথ'।

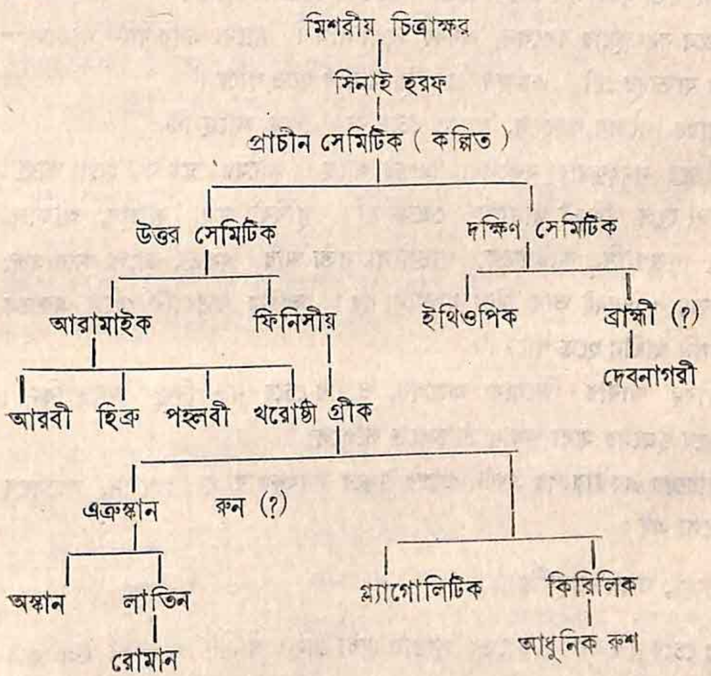
গ্রীকরা ফিনিসীয়দের মারফত সেমাইটদের থেকেই হরফ লিখতে শিখেছিলো। সেমাইটরাই পৃথিবীতে সকলের আগে শুধুমাত্র বর্ণের সঙ্গে বর্ণ জুড়ে লিখতে শিখেছিলো। চিহ্নের সঙ্গে ছবির সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সে জায়গায় তার

এনে বসিয়েছিলো নিছক শব্দের আওয়াজ। এক হিসেবে আজকের সমস্ত লেখাই তাদের কাছে ঋণী।

সেমাইটদের হরফে একটা অসুবিধে ছিলো এই যে তাদের কোনো স্বরবর্ণ ছিলো না। কাজেই গ্রীকরা সেমাইটদের কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ বানিয়ে ফেললো। এইভাবে এলো 'এ', 'ই', 'আই', 'ও', 'ইউ'।

সেমাইটদের লেখার ধরন প্রাচীন ভারতবর্ষও গ্রহণ করেছিলো—তাই থেকে এসেছে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি। ব্রাহ্মী লিপি থেকেই এসেছে আজকের দেবনাগরী হরফ। সেমাইটদের প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'অ' যোগ করে ভারতীয় লিপিতে মুশকিলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলো। 'প্' হলো 'প', 'ব্' হলো 'ব'। আ-কারাদি অন্যান্য স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

বিভিন্ন অক্ষরলিপি কিভাবে একটা থেকে আরেকটা এসেছে নিচে দেখানো হলো :



সবকিছুর গোড়ায়

ছান্দোগ্য উপনিষদে দুটো গল্প আছে। একালের ভাষায় বললে গল্প দুটো দাঁড়ায় এই ঃ

॥ নারদ আর সনৎকুমার ॥

প্রথম গল্পে নারদ এসে সনৎকুমারকে ধরলেন, 'আচার্যমশাই, আমাকে শিক্ষা দিন।' সনৎকুমার জিগ্যেস করলেন, 'আগে বলো তোমার বিদ্যের দৌড় কতোদূর।'

নারদ একটা লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। দেখা গেলো নেহাৎ কম জানেন না। বেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শব্দশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, কালতত্ত্ব, নক্ষত্রবিদ্যা, ধনুর্বেদ সবই তাঁর জানা। তাছাড়া তিনি জানেন সাপের বিষ ঝাড়তে, গন্ধদ্রব্য তৈরি করতে, নাচতে গাইতে বাজাতে।

শুনে সনৎকুমার বললেন, 'এসবই হলো নাম। নামের ওপর দখল থাকলে—নামের যতোদূর দৌড়, একজন ততোদূর স্বাধীন হতে পারে।'

নারদ জিজ্ঞেস করলেন, 'নামের চেয়ে বড়ো কিছু আছে কি ?'

উত্তরে সনৎকুমার বললেন, 'নিশ্চয় আছে। নামের চেয়ে বড় হলো ভাষা। ভাষা না হলে কিছুই জানানো যেতো না। পৃথিবী, জল, বাতাস, আকাশ, মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, সত্য আর অসত্য, ভালো আর মন্দ, নানা তত্ত্ব— এসবই ভাষা দিয়ে জানানো হয়। ভাষায় যতখানি দৌড়, একজন ততখানি স্বাধীন হতে পারে।'

নারদ আবার জিগ্যেস করলেন, ভাষার চেয়ে বড় কিছু আছে কিনা। এইভাবে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগলো।

নারদের একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার যা বললেন, সংক্ষেপে তা হলো এই ঃ

॥ ভাষা, অন্ন, প্রকৃতি ॥

ভাষার চেয়ে বড় মন। হাতের মুঠোর মধ্যে যেমন আমরা আমলকী ফল ধরে থাকি, তেমনি নাম আর ভাষাকে ধরে থাকে মন। মন দিয়ে আমরা একটা বিষয় স্থির করি, তারপর সেই বিষয়টা দখলে আনি।

মনের চেয়ে বড় সংকল্প। প্রথমে মন সংকল্প করে, তারপর ধারণায় আনে, তারপর মুখ নাড়ে, তারপর শব্দ বার হয়।

সংকল্পের চেয়ে বড় চিত্ত। কেননা মানুষ আগে অনুভব করে, তারপর সংকল্প করে।

চিত্তের চেয়ে বড় ধ্যান।

ধ্যানের চেয়ে বড় বিজ্ঞান। বিশেষভাবে জানার নামই বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের চেয়ে বড় বল। অনেক জানে শোনে এমন একশো জন লোককে একজন শক্তিশালী লোক একাই কাঁপিয়ে তুলতে পারে। জোর থাকলে তবেই মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে, কাছে যেতে পারে, দেখতে পারে, ধারণা করতে পারে, বুঝতে পারে, হাতেকলমে বিশেষভাবে জানতে পারে।

বলের চেয়ে অন্ন বড়। দশ দিন দশ রাত্তির না খেয়ে যদি কেউ বেঁচেও থাকে, তাহলেও সে দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, ধারণা করতে পারে না, বুঝতে পারে না, কাজ করতে পারে না, জানতে পারে না।

অন্নের চেয়ে বড় হলো জল। যদি বৃষ্টি ভালোমতো না হয় তাহলে ফসল ভালো হবে না। ভালো ফসল হবে না ভেবে দুঃখে প্রাণ কাঁদবে। আবার তেমনি ভালো বৃষ্টি হলে ভালো ফসল হবে ভেবে প্রাণে আনন্দ হবে।

জলের চেয়ে বড় তেজ। বাতাসের সাহায্যে সূর্যের তেজ আকাশকে তাতিয়ে তোলে। লোকে তখন বলে, 'এত যখন তাত, নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে।' তারপর মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায়। এসব দেখে লোকে বলে, 'এবার বৃষ্টি হবে।'

আকাশ তেজের চেয়েও বড়। সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি—সবই আকাশে থাকে। আকাশ মানে আবাঁধা, খোলা জায়গা। আকাশ আছে বলেই আমরা আওয়াজ করতে পারি, শুনতে পারি, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

॥ স্মৃতি, আশা, প্রাণ ॥

আকাশের চেয়ে বড় স্মৃতি। মানুষ যদি মনে করে রাখতে না পারতো, তাহলে অনেকে এক জায়গায় জড়ো হলেও কারো কথা কারো কানে ঢুকতো না, কে কী বলছে ধরতে পারতো না, কিছু জানাই সম্ভব হতো না।

স্মৃতির চেয়ে বড় আশা। আশা মানুষকে উৎসাহ জোগায়, উস্কে দেয়। যা পাইনি, তা পেতে চাই—এই চাওয়ার নামই হলো আশা। মানুষ যা কিছু জানে, যা কিছু করে—সমস্তই কিছু একটা পাবার জন্যে, অভাব ঘোচানোর জন্যে।

আশার চেয়েও বড় জীবন। জীবনই সবকিছুর গোড়ায়। নাম থেকে আশা পর্যন্ত যতো কিছু বলা হলো, জীবন না থাকলে তার একটাও থাকে না।

প্রথম গল্পটা এখানেই শেষ হলো। এ থেকে নারদ কী শিখেছিলেন জানি না। এর মধ্যে যে শিক্ষাটুকু আছে তা এই : মানুষের সমস্ত রকম সৃষ্টির গোড়ায়

আছে জীবন। বেঁচে আছি বলেই আমরা অভাব বোধ করি, যা পাইনি তা চাই। পাবার জন্যে গতর নাড়াই, কাজ করি। করতে গেলে বিশেষভাবে জানতে হয়। লেগে থাকলে তবেই জানা যায়। যেটা জানছি সেটা কথা বলে জানাই।

।। দলছুট দাল্‌ভ ।।

দ্বিতীয় গল্পটা যার সম্বন্ধে তার নাম বক। তার বাবার নাম দল্‌ভ। বকের আরও একটা নাম আছে। সে নামটা থেকে বোঝা যায় লোকটা দলছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গল্পটা এমন এক সময়ের যখন দলছাড়া হয়ে কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভবই নয়। বাঁচতে গেলেই দল বাঁধতে হবে। নিজের চেষ্টায় বাঁচা যায় কিনা দেখার জন্যেই সে বেরিয়েছিলো।

এমন সময় একদল মানুষ তার চোখে পড়লো। তাদের যে সর্দার, তার গায়ে সাদা চিহ্ন। সেই দলটা নিজেদের কুকুরের বংশধর বলে মনে করে। কুকুর নামে পরিচয় দেয়। শুধু দলের নয়, তাদের প্রত্যেকটি লোকের নামই হলো কুকুর।

দল্‌ভের ছেলে বক শুনতে পেলো লোকগুলো তাদের সর্দারের কাছে এসে বলছে, 'ভগবান, আমাদের অন্নের ব্যবস্থা করুন, আমরা খেতে চাই।' যে অন্ন উৎপন্ন হবে, সর্দার তার একটা ভাগ পাবে। সেই জন্যেই হয়তো সর্দারকে তারা 'ভগবান' বলেছিলো।

সর্দার তার উত্তরে বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে—তোমরা কাল ভোরবেলায় এইখানে আমার কাছে এসো।'

পরদিন কী হয় দেখবার জন্যে দল্‌ভের ছেলে বক অপেক্ষা করে থাকলো।

পরদিন সে যা দেখেছিলো তা এই।

লোকগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে হেলেদুলে যেভাবে নড়বার কথা সেইভাবে নড়তে লাগলো। তারা নিশ্চয় নাচছিলো।

কাজ করতে গেলে মানুষ যেমন জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে 'হুঁঃ' 'হুঁঃ' শব্দ করে, তেমনি শব্দ করে তারা বলতে (গাইতে) লাগলো ঃ 'ওম্‌। আমরা ভোজন করি। ওম্‌। আমরা পান করি।'

এসব দেখে দলছুট বকের চোখ খুলেছিলো কিনা গল্পে তা বলা নেই। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি দল বেঁধে অন্ন জোগাড় করবার দৃশ্যটা দেখে সে নিশ্চয় বুঝেছিলো মানুষ একা বাঁচতে পারে না। দলের মধ্যে থাকা দরকার। এই দলটার নামই সমাজ।

সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় ঃ খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের যে কাজ, তা থেকেই এসেছে নাচ-গান, তাল-মান-ছন্দ।

ছিরি-ছাঁদ

খাওয়াদাওয়ার কথা উঠতেই সেই নেমন্তন্নটার কথা বুঝি মনে পড়ে গেলো? বড্ড সকাল-সকাল এসে পড়েছো। চলো, ততোক্ষণ বিয়ে-বাড়িটা তোমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।

দেখো, দেখো—মেয়েরা থালায় করে কী নিয়ে যাচ্ছে দেখো! ঠিক পাহাড়ের চুড়োর মতো দেখতে। আসলে ওটা রং-করা পিটুলি। লোকে যাকে বলে 'ছিরি'। ওর একটা ভালো নামও আছে। ভালো নাম হলো 'শ্রী'। ছিদামের ভালো নাম যেমন শ্রীদাম।

॥ ব্যবহার আর বাহার ॥

ছিরিতে শুধু শোভা হয় তাই নয়। ছিরিতে নাকি শুভ হয়। শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই সমস্ত শুভকাজেই ছিরির দরকার। ধারণাটা একালের নয়। একদম সেকেলে। যখন মানুষ তুকৃতাকে বিশ্বাস করতো।

শ্রীর আরেক নাম লক্ষ্মী। ছিরি কিন্তু চাল-বাটা ছাড়া কিছু নয়। সেকালে সোনাদানা নয়, টাকাকড়ি নয়, গাড়িবাড়ি নয়—চালই ছিলো লক্ষ্মী। চাল-বাটা দিয়ে ছিরি বাঁধা মানে লক্ষ্মীকে বাঁধা। ঘরে লক্ষ্মী থাকলে শ্রীও থাকে। লক্ষ্মীর মধ্যে রূপ আর গুণ সমানভাবে মিলেছে।

ছিরি বলতে তাহলে শুধু রূপ নয়—গুণ। শুধু বাহার নয়—ব্যবহার। যাকে দেখতে ভালো, তাকে যদি তারিফ করে বলো: 'কী সুন্দর দেখতে তুমি। ঠিক যেন মাকাল ফল।' তাহলে সে তোমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে ছুটে আসবে। কেননা মাকাল ফল দেখতেই সুন্দর। মানুষের ভোগে আসে না। লক্ষ্মী কিংবা কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করলে বরং লোকে সুখী হয়। শৌখীন জমিদারদের পাল্লায় পড়ে একালের কার্তিক হলেন কোঁচা-দোলানো ফুলবাবু। সেকালের আসল কার্তিক ছিলেন কিন্তু জাঁদরেল সেনাপতি। রীতিমতো কাজের লোক।

॥ সাজানো গোছানো ॥

কী রকম ধুলো উড়ছে দেখো। যে লোকটা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে, তার কাজের কোনো ছিরি নেই। 'ছিরি' শুনে ভেবো না আমি রং-করা পিটুলির কথা বলছি। কাজের ছিরি নেই মানে লোকটা গোছ করে কাজ করতে পারে না।

কাজ করতে গেলেই গুছিয়ে করতে হয়। শুধু হাত-পা নাড়ালেই কাজ হয় না। হাত-পা আর মাথা একসঙ্গে খাটাতে হয়। ঐ লোকটা একদম আনাড়ি।

ওর হাত-পায়ের ঠিক নেই। ঝাঁটা কিভাবে বাগিয়ে ধরতে হয় জানে না। তাই উঠোনের ধুলোগুলোকেও বাগ মানাতে পারছে না।

একটার সঙ্গে আরেকটাকে মিলিয়ে, মিশিয়ে, খাপ খাইয়ে, মানানসই করে কাজ করতে হয়। নইলে সে কাজের কোনো আদায় নেই, ফল নেই। তাই সে কাজের কোনো ছিরিও নেই।

উঠোনের এক কোণে পাঁচ ফুলের সাজি নিয়ে বসে একটি মেয়ে একমনে কী যেন করছে দেখো। ফুলের তোড়া বাঁধছে আর মালা গাঁথছে। সাজির মধ্যে একরাশ ফুল তালগোল পাকিয়ে জড়ামড়ি করে আছে। মেয়েটা তা থেকে একেকটা করে ফুল বেছে নিয়ে পরের পর মানানসই করে এমনভাবে সাজাচ্ছে যে, তারা মিলে মিশে সুন্দর হয়ে উঠছে। একই ফুল—কিন্তু তোড়া বাঁধার সময় একভাবে, মালা গাঁথার সময় আরেকভাবে সাজানো হচ্ছে। এক লোহা থেকে যেমন ছুরি, কাঁচি, নরুন রকমারি জিনিস হয়। নাঃ, মেয়েটার দেখছি কাজের ছিরি আছে।

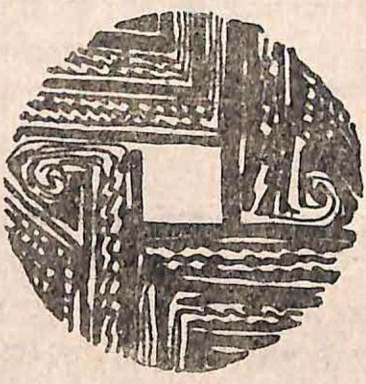
॥ লাবণ্য ॥

খুব ক্ষিধে পাচ্ছে বুঝি। চলো দেখে আসি রান্নার দেরি কতো।

উনুন তো নয়, যেন রাবণের চিতা। যে লোকটা রাঁধছে, শহরের সে একজন নামকরা হালুইকর। রান্নার মধ্যেও কতো কারিকুরি দেখো। আগে ঠিক করতে হবে কী রাঁধবো। নানা জিনিসে মিশেল করে তবে রাঁধা যাবে। মেশাতে হবে মাপ মতো। কোন জিনিসের কী গুণ তা জানতে হবে। আর সেইসঙ্গে চাই হালুইকরের পাকা হাত।

মাংসের ঝোলটা কী সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখো। এসো একটু চেখে দেখা যাক। এ ছি, ছি। একদম নুন দেয়নি। ঝোলের সমস্ত স্বাদ মাটি হয়ে গেছে।

নুন হলো লবণ। লবণ থেকেই আসে লাবণ্য। নুন বেশি হলে কিংবা কম হলে স্বাদ নষ্ট হয়। তেমনি লাবণ্যের কমবেশি হলে ছিরি নষ্ট হয়।



এবার এসো তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।

উঠোনের একধারে পিঁড়ির ওপর বসে আছে বর। সেকালে কিন্তু যে বিয়ে করতো তাকে বর বলত না। যে কনে দেখে পছন্দ করতো, তাকেই বলতো বর। 'বর' মানে হলো ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা,—বেছে নেওয়া, আলাদা করা।

॥ অর্ধেক আয়না ॥

আচ্ছা, এবার বরের মুখের দিকে তাকাও তো! মনে মনে বরের মুখটাকে নাক-



বরাবর দুভাগ করে নাও। এবার মুখের ডান পাশের সঙ্গে মুখের বাঁ পাশটা মিলিয়ে দেখো। হুবহু এক রকমের নয়? আয়নায় যেমন উল্টো ছাপ পড়ে, বাঁদিকটা ডান দিক হয়ে যায়, ডানদিকটা বাঁদিক হয়ে যায়—তেমনি মুখের একটা পাশ যেন অন্য পাশটার আয়না হিসেবে কাজ করছে। শুধু মুখ নয়, মানুষের গোটা শরীরটাকেই এইভাবে দুটো সমান ভাগে ভাগ করা যায়।

একটা কাগজে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষের একটা ছবি আঁকো। তারপর ছবিটা কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। এবার কাটা ছবিটা মাঝখান থেকে সোজাসুজি ভাঁজ করো। দেখবে ঠিক ভাঁজে ভাঁজে মিলে যাচ্ছে।



মানুষের শরীরে এই সামঞ্জস্য যদি না থাকতো, কী রকম দেখাতো বলো তো? একটা চোখ যদি অন্য



চোখের মতো না হতো? দুটো কানের মধ্যে একটা যদি হতো কুলোর মতো? একদম ছিরি থাকতো না। শুধু কি তাই? কবিদের উপমা অনুসারে কারো নাক যদি সত্যিই বাঁশির মতো হতো, তাহলে কি তাকে সুন্দর দেখাতো? মোটেই না। তাছাড়া ট্রামে-বাসে ভিড়ের মধ্যে অত বড়-নাক নিয়ে কী বিপদে পড়তে হতো ভাবো তো।

॥ ছাঁদনাতলা ॥

পিঁড়ির ওপর যেখানে টোপর মাথায় দিয়ে বর বসে আছে, সে জায়গাটাকে কী বলে জানো? ছাঁদনাতলা। ছাঁদনাতলার ভালো নাম ছন্দস্থলী। শ্রী থেকে যেমন ছিরি, ছন্দ থেকে তেমনি ছাঁদ। শ্রী-ছন্দ মিলে হয় ছিরি-ছাঁদ।

যা আচ্ছাদন করে, ঢেকে দেয়, আড়াল করে দেয়—তাকেই বলে ছন্দ। ছাঁদনাতলায় ছন্দ কোনটা? বরের মাথার ওপর চাঁদোয়া টাঙানো হয়, যাতে দিনের তাপ আর রাতের হিম না লাগে। মাথা গুঁজবার ঠাঁই সেই চাঁদোয়াটাই

হলো ছন্দ। মাথার ওপরটা খোলা না রেখে ছাদ দিয়ে, ছাঁদ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, খাপছাড়াভাবে আছে—তাকে বাঁধছে ছন্দ। চাঁদোয়ার তলায় থাকে থালার ওপর রং-করা পিটুলির ছিরি। ছিরিকে ঘিরে থাকে ছাঁদ।

।। ছন্দের নাড়া ।।

ছাঁদনাতলায় যে ব্যাপারটা হয় তাকে বলে ছাঁদনি-নাড়া। ছন্দের শক্তিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলা হয়। ছন্দের নাড়া বাঁধা মানে মঙ্গলসূত্র বাঁধা।

তাহলে ছিরি যেমন, তেমনি ছন্দ জিনিসটাও মঙ্গলের জন্যে। কাজ আদায়ের জন্যেই তাহলে এতসব ছাঁদা বাঁধাবাঁধি।

ছাঁদনাতলায় ছন্দকে কিভাবে নাড়া দিয়ে জাগানো হচ্ছে চলো দেখা যাক। ছন্দ মানে যখন ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা বোঝায়, তখন বরও নিশ্চয় ছন্দ। কেন না 'বর' মানেও ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা বোঝায়। বরের মধ্যে যে ছন্দ, তাকে প্রথমে ছড়ি দিয়ে,নিমুখ লতা দিয়ে, রাঙা সুতো দিয়ে মেপে নেওয়া হচ্ছে। তারপর বরণডালার ঘা দিয়ে, আলোর উত্তাপ দিয়ে, শব্দের ঝংকার দিয়ে সেই ঘুমন্ত ছন্দকে নাড়া দিয়ে জাগনো হচ্ছে। বরণডালায় থাকে সেই জিনিস, যা বাঁচবার জন্যে দরকার। সাত পাক দিয়ে তবে হয় বরণ। সাত পাক কেন? বৈদিক ছন্দ সাতটি। সেই সাত ছন্দ দিয়ে নতুন ছন্দ আনা হচ্ছে। এ যেন পিদিমের আলো থেকে পিদিম জ্বালানো। যেমন প্রাণ থেকেই আসে প্রাণ, তেমনি ছন্দ থেকেই আসে নতুন ছন্দ। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বর-বধূর হাতে হাত বাঁধা হচ্ছে। গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে।

॥ ছন্দ আর চন্দন ॥

কনের কপালে সাদা কিসের চিহ্ন বলো তো? •চন্দনের ফোঁটা। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বিয়ের সাজে তাকে সাজানো হয়েছে। চন্দনের গন্ধটাও ভালো, দেখায়ও ভালো। আবার ফোড়া হলেও অনেকে ছোটো ছেলেদের গায়ে চন্দন মাখায়। 'চন্দ' থেকেই এসেছে চন্দন। ছন্দ কথাটার মূলেও আছে 'চন্দ' অর্থাৎ আনন্দ দেওয়া। যা আনন্দ দেয় তা চন্দ্র, চন্দন, ছন্দ। যা কাজে লাগে তা আনন্দও দেয়। কাজের মধ্যেই তাহলে আনন্দ। চোখে কাজল দিলে দেখায়ও ভালো; চোখও তাতে ভালো থাকে। চামড়া আর নখের শোভা বাড়ায় আলতা; তাতে চামড়া আর নখ ফাটে না।

আদিমকালেও মানুষ এমনিভাবে গায়ে রং মাখতো। রঙের অন্য নাম বর্ণ।

'বর' থেকেই এসেছে বর্ণ। সূর্যের তাপ যাতে না লাগে কিংবা পোকামাকড় যাতে বসতে না পারে, তারই জন্যে সে-যুগে মানুষ রং দিয়ে গায়ের চামড়া ঢেকে রাখত। বর্ণ বলতে ছাইভস্ম, কাদামাটি, গাছগাছড়ার রস কিংবা জন্তু-জানোয়ারের চর্বিও বোঝাত। এসব আবার চিহ্ন হিসেবেও ব্যবহার হত। সিঁদুর যেমন এয়োতির চিহ্ন।

যা ছিল এককালে নেহাত ব্যবহারের জিনিস, ক্রমে তা কেমনভাবে নিছক বাহারে জিনিস হয়ে দাঁড়ায় মেয়েদের হাতে হাতে তার প্র'াণ পাওয়া যায়। কনের হাতে দেখো সোনার কাঁকন। শুধু কাঁকন হাতে নয়, প৷য়ে পরেছে রুপোর মল। যাকে বলে কিঙ্কিণী।

॥ **গহনা-বাজনা** ॥

আদিমকালে কিন্তু হাত-পায়ের এই গহনাগুলো রীতিমতো কাজে লাগত। শব্দের তালে তালে পা ফেলার সুবিধে হত। তাই বলে আদ্যিকালে কেউ সোনার গহনা পরত না। তখন ছিল লোহা কিংবা অন্য কোনো ধাতুর গহনা। তারও আগে ছিল হাড়ের কিংবা কড়ির থলি। হাত-পা নাড়লেই খুট-খাট ঠুং-ঠাং শব্দ হত। শব্দের তালে তালে হাঁটা-চলা করার, কাজ করার সুবিধে। নাচতে গেলে ঘুঙুর লাগে। আবার দূরের গাঁ থেকে শহরবন্দরে চিঠির থলি নিয়ে ছুটে যায় যে রানার, তারও একটা ঝুমঝুমির দরকার হয়। পুরাণে ঘণ্টাকর্ণের গল্প পাওয়া যায়। ঘণ্টা যে কানের সঙ্গে লাগানো থাকত, তা হয়তো ঠিক না হতেও পারে। কানে যাতে ঘণ্টার শব্দ পৌঁছোয়, সেইভাবেই হয়তো ঘণ্টা বাঁধা থাকে। তাতে চলবারও সুবিধে, চেনবারও সুবিধে। গহনা জিনিসটা এককালে ছন্দের কাজ করত। মেয়েদের হাতের শাঁখা আর লোহা হয়তো আজও সেই স্মৃতিটাই বহন করছে। গহনা শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও পরত!

এমন সময়—

কে এসেছে কে এসেছে
ডেকে ওঠে ময়না।
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
মানুষ তো নয়, গয়না॥

গজেন্দ্রগমনে এক জমিদার-গিন্নি আসছেন দেখো। আপাদমস্তক সোনার গহনা। উনি গহনা গায়ে দিয়েছেন, না গহনার মোট বয়ে বেড়াচ্ছেন বোঝা মুশকিল। আসলে জমিদার-মশাই গিন্নিকে দিয়ে নিজের বিজ্ঞাপনের কাজটা করিয়ে নিচ্ছেন। জমিদার-মশাই তাঁর গিন্নির গায়ে গহনা ঝুলিয়ে সবাইকে

জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অগাধ পয়সা। অথবা টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে না রেখে গিন্নির গায়ে নগদ সোনাদানা হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন। এটাও একটা মান্ধাতা আমলের পুরনো প্রথা।

যে হাত কোনো কাজ করে না, সে হাতে চুড়িগুলো বেসুরো হয়ে বাজে। চুড়ি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য আনে না, বোঝা হয়ে ওঠে, টাকার গরম দেখায়—সেখানে তা হয়ে দাঁড়ায় হাতপায়ের ডাণ্ডাবেড়ি, নিছক লোক-দেখানো ঢং!

যাকে আমরা চলিত কথায় বলি 'ভড়ং'। কিন্তু এককালে এই ভড়ং ছিলো কাজের জিনিস—'ভড়ং' ছিল সেকালের এক রকমের যুদ্ধ-যন্ত্র। কিন্তু যেই তার দরকার ফুরিয়ে গেলো, অমনি সেটা হয়ে দাঁড়ালো বাজে জিনিস। একদম ভড়ং।

গহনার ভালো নাম অলঙ্কার। 'অলম্ করে', তাই অলঙ্কার। অলম্ কথাটার দুটো মানে পাওয়া যায়। 'অলম্'-এর একটি অর্থ 'প্রয়োজন মেটানো', অন্য অর্থ 'প্রয়োজন না থাকা'। গোড়ায় হয়তো শুধু প্রথম অর্থটাই ছিলো। পরের অর্থটা পরে এসেছে। 'আভরণ' কথাটার মধ্যেও এমনি মানে বদলাবার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সম্পূর্ণ করে ভরিয়ে তোলে বলেই সেটা আভরণ। কিন্তু 'আভরণ' জিনিসটা যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে—তখন সেটা বাড়তি, নিরর্থক, ফালতু।

॥ কাজ ফুরোলে ॥

চলতি কথায় আমরা বলে থাকি : 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী', কথাটা খুবই সত্যি। যেটা কাজে লাগে, তারই আদর থাকে। দরকার থাকলে তবেই কোনো জিনিসের দর থাকে। যেটার দর আছে সেটাই সুন্দর। দর মানে চাহিদা। চাইলে তবেই দর হয়। যেটা চাই সেটাই সুন্দর। চাই বলেই সুন্দর।

কী বললে? শুনতে পাওনি? এত হৈ চৈ হচ্ছে যে এখানে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলার উপায় নেই। তাহলেও দেখো, সবাই কী খুশি। ভিড় আর হট্টগোলের জন্যেই বিয়েবাড়িটা সুন্দর জমে উঠেছে। কিন্তু বিয়ে চুকে যাবার পরও যদি এ-বাড়িটায় এ রকম ভিড় আর হট্টগোল চলতে থাকে? তাহলে এ-বাড়ির লোকেরা ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসবে। কেননা তখন তারা চাইবে নিরিবিলিতে থাকতে।

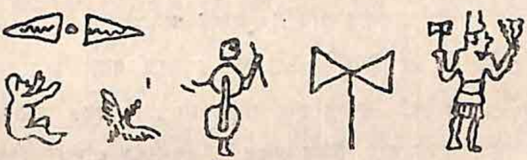
ওকি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে! এক্ষুণি বোধহয় জোর বৃষ্টি নামবে। তা হলেই তো চিত্তির। ছাঁদনাতলা ভেসে গিয়ে বিয়েটাই না ভেস্তে যায়। কিন্তু যাই বলো—বৃষ্টিটা হলে চাষীরা বাঁচবে। নইলে খরা লেগে ধানগাছগুলো যে

পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তার মানে, এখন বৃষ্টি হলে বিয়েবাড়ির লোকদের কাছে খুবই খারাপ লাগবে, কিন্তু গাঁয়ের লোক দুহাত তুলে নাচবে। একই জিনিস স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভালো কিংবা মন্দ, সুন্দর কিংবা অসুন্দর হয়।

॥ বস্তুর মধ্যে থাকে ॥

একদল লোক আছে, যারা বলে সৌন্দর্য হলো আলাদা ব্যাপার, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কোনো জিনিসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। সৌন্দর্যের একটা ধরা-বাঁধা মন-গড়া মাপকাঠি আছে তাদের কাছে। সবকিছুকে তারা সেই মাপটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুন্দর করে নিতে চায়। তাদের কাছে মাপটাই সৌন্দর্য।

লোকগুলো ঠিক যেন গ্রীক পুরাণের সেই ডাকাতের মতো যার মাপ-করা একটা টেবিল ছিল। লোক ধরে এনে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে যদি দেখা যেত লোকটা টেবিলের মাপের চেয়ে বেঁটে, তাহলে তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা করা হত; যদি দেখা যেত তার ঠ্যাং লম্বা হয়ে যাচ্ছে—তাহলে কুড়ুল দিয়ে বাড়তি অংশটা কেটে ফেলা হত।



বস্তু বাদ দিলে সৌন্দর্য থাকে না। একটা সুন্দর মাটির পুতুল যদি ভেঙে যায়, কোথায় থাকবে তার সৌন্দর্য? বস্তুর মধ্যেই থাকে ছিরিছাঁদ। বস্তুর ভাবই হলো রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ। মাটির সরাটা যদি হাত থেকে পড়ে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তার গোলাকার রূপটা আর থাকে না। পাথরের বাটি পাথর দিয়েই তৈরি হয়। সোনার পাথরের বাটি হয় না। তেমনি কাঁঠালের আমসত্ত্ব হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। যে দুধ খায়নি, সে দুধের স্বাদ কেমন করে বুঝবে? দুধের স্বাদ কখনই ঘোলে পাওয়া যায় না। ঢোলক না থাকলে ঢোলক বাজানো যায় কি? তোমার হাতে ঢোলক দিয়ে কেউ যদি এস্রাজের সুর শুনতে চায় তাহলে তাকে তুমি নিশ্চয় পাগল ভাববে। ফুল না থাকলে ফুলের গন্ধ থাকে কি? পচা ডিমে কেউ ফুলের গন্ধ খোঁজে না। চেয়ার থেকে তুলোর গদিটা তুলে ফেললে তখনও কি নরম ঠেকে? তুলোর বালিশে যে আরাম সেই আরাম পাবার জন্যে কেউ কি কাঠের তক্তা মাথায় দেয়?

॥ দর, আদর, সুন্দর ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে বস্তু হলেই হয় না। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে লাগ-সই বস্তু হওয়া দরকার। ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার সেখানে তেমনটি হতে হবে।

দর কথাটা যেখান থেকে এসেছে, তার গোড়াকার অর্থ হলো ফুটো করা, বিঁধ করা, খোঁড়া। হরিণ মারতে গেলে বাণ দিয়ে বেঁধা দরকার, গরু বাঁধবার খোঁটা দরকার, উঠোনে চাষ করতে গেলে খোন্তা দরকার। কেন দরকার? বাঁচবার জন্যে। হরিণ, গরু, ধান—মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলেই তাদের এত আদর।

হরিণের ভালো নাম মৃগ। মৃগ বলতে শুধু হরিণ নয়, শিকারযোগ্য যে কোনো পশুই বোঝায়। যে দিক দিয়ে গেলে শিকার মেলে, সেইটাই হল মার্গ বা পথ। শিকারে যাবার আগে মেতে উঠতে হবে, তাই চাই মৃদঙ্গ, মর্দল বা মাদল। মৃগকে বয়ে আনে, মারতে সাহায্য করে, তাই বাতাস মৃগবাহন বা মরুৎ। মারবার পর চঞ্চল পশু হল শান্ত, মৃত। তারপর মার্জিত করে তাকে খাওয়ার যোগ্য করা হল। লক্ষ্য, উপায়, আবেগ, উপলব্ধি, রুচি—সমস্তই বাঁচবার জন্যে 'মর' অর্থাৎ মারবার কাজটা থেকেই এসেছে।

দরকারে লেগেছিল বলেই হরিণ এত সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছিল মানুষের কাছে। শুধু যে হরিণই সুন্দর হল তাই নয়। হরণ করার সঙ্গে যা কিছু জড়িত ছিল তাই হয়ে উঠল সুন্দর। যেখানে হরিণ নিজেকে ঢেকে রাখত, তা হল হরিৎ। বুকের মধ্যেকার ধুকপুকুনিটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই এত কাণ্ড, হৃৎ, হৃদয় অর্থাৎ প্রাণের জন্যেই হরণ। হরণের কাজটাই হলো হর্ষ। 'হর' কথাটার মধ্যে 'সমূহ' অর্থাৎ, সকলে মিলে দল বাঁধার ভাবটাও যেন লুকিয়ে আছে। একা একা বাঁচা নয়, দল বেঁধে বাঁচা। 'হর'ই বোধ হয় চাষবাসের যুগে 'হল' হয়ে দাঁড়াল। যা ছিল 'হরিণ', যা ছিল সবুজ, পরে তাই কি 'হলুদ' হয়ে গেল? পাকা ধানের ছড়া তো হলুদ রঙেরই? 'হৃৎ' হল 'হ্লাদ'? দল বাঁধার দরুনই কি 'হল্লা'? 'হর'ই কি পরে 'হল' এবং তারপরে 'কল' হয়েছে? তাই থেকেই কি দেবতাদের আর পালপার্বণের নাম হলো—হর, হরি, হারীতী, হোলি, কালী?

॥ নতুন দরকারে ॥

দরকার ফুরিয়ে গেছে—তবু হরিণের ছবি, হরিণের গল্প ভালো লাগে কেন? তার মানে এ নয় যে, বাঁচতে গেলে আজও আমাদের শিকার করা দরকার। হরিণ

এখন কামনার প্রতীক। হরিণের মাংস খেয়ে বাঁচবার কথা আমরা ভাবিই না। তবু হরিণ দেখে বাঁচবার ইচ্ছেটা বেড়ে যায়। যে অভাব আজ আমাদের আছে সেই অভাবটা তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়। আর সেই সঙ্গে মানুষকে ঠেলে দেয় নতুন ধরনের সামাজিক কাজে। সবুজ রং, পাকা ফসল হয়েছে জীবনের প্রতীক। পুরনো জিনিস প্রতীক হয়ে নতুন দরকারে লাগছে। আজ নতুন দরকারে লাগছে হরিণ নয়, হরিণের ভাব।

সুন্দর আর মঙ্গল যেন এপিঠ আর ওপিঠ। একটি আরেকটিকে ধরে আছে। যারা তালকানা, তারা শুধু একটা দিকই দেখতে পায়। কেউ দেখে শুধু সুন্দর, কেউ দেখে শুধু মঙ্গল। একটা দিক যখন তারা দেখে, তখন অন্য দিকটা দেখতে পায় না—ভাবে অন্য দিকটা নেই।

॥ আগা আর গোড়া ॥

একটা বীজ থেকে যখন অঙ্কুর বেরোয়, তখন তার আগা আর গোড়ার মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মূল জিনিসটা যখন চোখের আড়ালে চলে যায়, তখন ওপরকার গাছ আর ডালপালাটাই চোখে পড়ে। কিন্তু মাটির নিচে থেকে গাছের শেকড় রস জোগাড় করে বলেই গাছটা বেঁচে থাকে। নইলে গাছটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতো। শেকড়ের জোরেই ডালপালাগুলো বাড়তে পারে, গাছে ফল ধরে। কিন্তু তাই বলে ওপরকার ডালপালাগুলোও চুপচাপ বসে থাকে না। সূর্যের তেজ থেকে, হাওয়া থেকে খাবার যোগাড় করে শেকড়ে পৌঁছে দেয়, গোড়া শক্ত করে।

গাছের এই আগার দিকটায় থাকে শিল্প আর সাহিত্য, গোড়ায় থাকে মানুষের জীবন আর সমাজ।

খেতে যাবার ডাক পড়েছে। তোমার অত তাড়া কিসের? একটু পরেই না হয় যাবে। এমন তো নয় যে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছো। সবটা না শুনলে শেষটায় আধ-কপালে হবে।

এতক্ষণ যা বললাম চট করে দু-চার কথায় একবার ধরিয়ে দিই।

ছিরি-ছাঁদ জিনিসটা আকাশ থেকে পড়েনি। এসেছে সমাজের দরকারে। মানুষই তৈরি করেছে এই ছিরি-ছাঁদ। শ্রীর মধ্যে আছে সুন্দর আর মঙ্গল, বাহার আর ব্যবহার। ছন্দের দরুনই আসছে শ্রী। ছন্দ হল কাজ। কাজ থেকেই আসছে সৌন্দর্য আর মঙ্গল।

।। কাজ করা ।।

যেটা মানুষের তৈরি, সেটাই হয় শিল্প। একমাত্র মানুষই হতে পারে শিল্পী। প্রকৃতির অনেক কিছুর মধ্যেই সুর আছে, সামঞ্জস্য আছে, ছবি আছে। কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে শিল্পী বলি না। কেননা ওটা হল স্বভাব। তেমনি মৌমাছি যে চাক তৈরি করে, মাকড়সা যে জাল বোনে—তার জন্যে তাদের আমরা শিল্পী বলি না। ওটা তারা নিছক স্বভাবের তাড়নায় করে। ভেবে চিন্তে করে না। চাওয়া আর করার মধ্যে তাদের কোনো তফাত নেই।

কিন্তু মানুষ যেটা গড়ে, সেটা শুরুতেই তার মনের মধ্যে থাকে। গড়বার আগে মানুষ মনে মনে এঁচে নিতে পারে। একজন তাঁতী যখন কাপড় তৈরি করে, তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখা যাক। সুতোর গড়নটা বদলে কাপড়ের গড়নে আনতে হয়। বুনবার আগে কাপড়ের গড়নটা সে মনে মনে এঁচে নেয়। সে ঠিক করে নেয় জাল নয়, গামছা নয়—সুতো দিয়ে সে কাপড় বানাবে। কাপড় তৈরি করাটাই তার লক্ষ্য, তার উদ্দেশ্য। তারপর কাপড় তৈরি হওয়া মানে তার উদ্দেশ্যটাই সিদ্ধ হওয়া। যেটা সে চেয়েছিল সেটা সে পেলো।

উদ্দেশ্যটা যখন একবার ঠিক হল, তখন তার মধ্যে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হবে। খামখেয়ালিপনা চলবে না। কাপড় তৈরি করতে করতে তাঁতীর যদি গামছা বোনবার খেয়াল চাপে—তাহলে কাপড় হবে না, শিব গড়তে বাঁদর তৈরি হবে। কাজ করতে করতে আগাগোড়া উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখা চাই। গোটা কাজের ধাঁচের ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্যটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজের ইচ্ছেটাকে উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। শুধু গা লাগানো নয়, মনটাকেও লাগাতে হবে।

।। কাজ আর ছন্দ ।।

লক্ষ্য থাকলে তবেই সেটা কাজ হয়। কিছু একটা পাবে বলেই মানুষ কাজ করে। যে কাজে ফল নেই তাকে কাজ বলে না। যে কাজ করছে, কাজের ফলটা যদি তার মনের মতো না হয়—তাহলে কাজ করাটা হয় হয়রানির সামিল। কাজের মধ্যে আনন্দ থাকে না, কাজ জিনিসটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় ঝকমারির ব্যাপার।

ছন্দ কথাটার মধ্যে আছে এইসব ভাব—ছাড়া, বাঁধা, আর আনন্দ। মাথার ওপরকার খোলা, খালি, ছাড়া জায়গাটা যখন বাঁধি সেটা হয় ছন্দ, ছাঁদনা, ছাদ, চাঁদোয়া। ছেড়ে বাঁধছি কেন? তা থেকে ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে। ফলটা যদি ভালো হয়, ছেড়ে বাঁধার কাজটা হয় আনন্দের—ছন্দটা হয় মনের মতো। মানুষ যে কাজ করে, সেটাই তাহলে ছন্দ। ছাড়া, বাঁধা, উদ্দেশ্য, আনন্দ—কোনো একটা বাদ দিলে ছন্দে খুঁত হবে।

ছন্দ জিনিসটা যেন লাগাম। ঘোড়া যদি ছাড়া অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না। ঘোড়া থাকলো বনে, আর আমি এখানে মনে মনে ঘোড়ায় চড়ছি, তা তো হয় না। বুনো ঘোড়া ধরে আনতে হবে, বশ করতে হবে। কিন্তু এনে যদি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখি, তাহলেও ঘোড়ায় চড়া হবে না। তাকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে ছেড়ে বাঁধতে হবে। একেবারে ছাড়া নয়, একেবারে বাঁধা নয়। দড়ি কিংবা শেকল হলে চলবে না। লাগাম দরকার।

'করা'র ব্যাপার থেকেই পরে এসেছে 'কলা'র ব্যাপার। কাজ থেকেই শিল্প। করা আর কলা, কাজ আর শিল্প যে আগে এদেশে এক চোখেই দেখা হত—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র চৌষট্টি কলার নাম থেকেই তা বোঝা যায়। কয়েকটি নাম এখানে তুলে দিচ্ছি :

নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, কৌচুমার (সাজসজ্জা না মেরামতি?), নেপথ্য (বেশবাস), দশন-বসন-রঞ্জন (দাঁতে মিশি আর কাপড়ে রং লাগানো), গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্য তৈরি), আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, যুদ্ধবিজয়বিদ্যা, পাকবিদ্যা, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), ডালা কুলো তৈরি, খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘব (হাত পাকানো), আকর্ষণ ক্রীড়া (কুস্তি?), বাস্তুবিদ্যা (ঘরামি), ছলিতক (ঠকানো না খেলা?), বৈনয়িকী বিদ্যা (আদব-কায়দা), পশুপক্ষী লড়ানো, পাখি পড়ানো ইত্যাদি। সমস্তই হলো কলা। ইংরেজিতে 'কালচার' বলতে যত কিছু বোঝায়, এখানে 'কলা' বলতে তত কিছুই বুঝিয়েছে। কাজ, তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার, খেলা, শিল্প সবকিছুই।

চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হল কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম।

।। কাজের ছন্দ, শিল্পের ছন্দ ।।

কিন্তু কাজের ছন্দ আর শিল্পের ছন্দ এক নয়। কাজের ফলটা পাওয়া যায় হাতে হাতে। কাজের ফলটা হলো বাস্তব। কাজ করে সোজাসুজি বাস্তবকে বদলানো যায়। কিন্তু শিল্পের ফল হলো আবেগ-অনুভূতি। মনটাকে নাড়া দেওয়া, মনে দোলা দেওয়া, মনটাকে কাজের দিকে ঠেলে পাঠানোই হলো শিল্পের কাজ। তারই জন্যে ছন্দের দরকার। ছন্দ ছাড়া শিল্প হয় না। যাতে ছন্দ নেই, তা হয় ধন্ধ-মারা, নয়তো ছন্নছাড়া।

ছন্দের একটা দিক চোখে দেখে অনুভব করার ; অন্য দিকটা কানে শুনে অনুভব করার। তার মানে এ নয় যে, ছবি দেখে শুধু চোখই খুশি হয়। চোখে

যেটা দেখি, তার মধ্যে নিছক সামঞ্জস্য থাকে না। থাকে প্রাণ। ছবি জিনিসটা শুধু মাপজোকের ব্যাপার নয়। তা যদি হত, তাহলে প্রতিমার বদলে কাঠামোটা নিয়েই আমরা খুশি হতাম। জীবনের ধারণা না দিলে ছবি হয় না। ছবিতে বাঁধা পড়ে স্থান। কিন্তু সেই স্থানটার মধ্যে গতির ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার মধ্যে রস থাকা চাই। 'রস' মানেই হল গতি।

॥ চোখ আর কান ॥

ঘড়িতে ঠিক বাঁধা নিয়মে টিক্ টিক্ শব্দ হয়। তালে তালে, নির্ভুল আওয়াজ হলেও তাকে আমরা সুর বলি না। তালের সঙ্গে প্রাণের যোগ থাকলে তখনই সেটা হয় সুর। তখন সেটা দাঁড়িয়ে একঘেঁয়ে তাল-ঠোকা নয়—তালে তালে চলা। চললে তাতে রস থাকে।

প্রাণ যার মধ্যে আছে, তাকে রূপে রসে স্পর্শে গন্ধে শ্রবণে আমরা ধরতে পারি। ধড় বাদ দিয়ে যেমন প্রাণ থাকতে পারে না, তেমনি পদার্থ বাদ দিয়ে গতি, বস্তু বাদ দিয়ে ভাব থাকতে পারে না।

যখন আমরা কানে সুর শুনি, তখন যে আমরা একদম কানা হয়ে থাকি তা নয়। সুরের টানে ছবিও এসে হাজির হয়। একটা সুর শুনে চোখে-দেখার কত স্মৃতি, কত আশা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে। আবার যখন ছবি দেখি, তখন যে আমরা একদম কালা হয়ে যাই তা নয়। ছবির টানে সুর এসে হাজির হয়। কোনো একটা ছবি দেখে সুরের ঝঙ্কার-তোলা কত স্মৃতি, কত আশা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে।

জীবন বাদ দিলে ছন্দ হয়ে যায় নিছক ঠাট। জীবন মানে একা বাঁচা নয়, একসঙ্গে মিলে বাঁচা। অন্য সব প্রাণীর বেলায় একা একা বাঁচা। মানুষের বেলায় জীবনে জীবন যোগ করা। দল বেঁধে বাঁচা। তাই, মানুষের ছন্দে শুধু জীবনের রসই থাকে না, থাকে সমাজ-বাঁধা রস। একার ছন্দ নয়, অনেকের ছন্দ।

বৈদিক সাতটি ছন্দে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ছন্দের নাম থেকেই বাঁচার আয়োজন আর সেই সঙ্গে সকলে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে বাঁচার ভাবটা আন্দাজ করা শক্ত নয়।

বৈদিক ছন্দ আছে সাতটি: গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী, উষ্ণিক, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্। এই নামগুলোর পেছনে উৎপাদন-সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষের বাঁচা-সংক্রান্ত কোনো না কোনো সামাজিক কাজ না থেকে পারে না। এর কোনোটাই হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি।

কী বললে? ভূঁইফোঁড় নয়? কোনো কোনোটা কিন্তু ভূইফোঁড় হতেও

পারে। যেমন, ধরো 'বৃহতী' এক রকমের শস্য। গাছপালামাত্রই তো ভূঁইফোঁড়। ক্ষেতের আল হল 'পঙ্‌ক্তি'। 'উষ্ণিক' কি উড়কি ধান, না রবিফসল। 'ত্রিষ্টুপ্‌' কি ধান-কাটা? 'জগতী' মানে তো গরু। 'গায়ত্রী' তো প্রাণ বাঁচাবার উপায়। 'অনুষ্টুপ্‌' এসেছে সকলের পরে। অনুষ্টুপ্‌কে বলা যায় সেকালের 'তরুণতম'—অর্থাৎ 'আধুনিক'।

॥ আধুনিক ॥

আধুনিক হলে গোঁড়া লোকে গোড়ায় বাধা দেয়, দুর্নাম করে। তাই 'অনুপষ্টু' ছন্দেরও সেই মুশকিল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বৈদিক যুগের পর 'অনুষ্টুপ্‌' ছন্দটাই খুব বেশি রকম চলতে লাগলো। ব্যাপার দেখে একদল লোক রটাতে লাগলো প্রজাপতির পা থেকে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ, ঘোড়া আর শূদ্র হয়েছে। ঘোড়া যেমন মোট বয়, শূদ্রকেও তেমনি মোট বওয়ার কাজ করতে হয়। এইভাবে ঘুরিয়ে অনুষ্টুপ্‌কে মুটেমজুর বলে উপহাস করা হল। এই ধরনের পৌরাণিক গল্প যত গাঁজাখুরি বলেই মনে হোক্‌ না কেন, গাদগুলো গালিয়ে নিলে এ থেকে পাওয়া যাবে ইতিহাসের অনেক সোনাদানা।

অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ বোধহয় তখনই এসেছে, যখন এক সমাজ গিয়ে আরেক সমাজ জন্ম নিচ্ছে। নতুন সমাজে এসেছে নতুন সামগান। তার নাম 'বৈরাজ'। এ থেকেই বোঝা যায় আগেকার সেই শ্রেণীহীন সমাজ আর নেই। সমাজ দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে—বীর আর বৈর। যুদ্ধে যারা জিতেছে, তারা একদলে; যারা হেরেছে তারা একদলে। এই শেষের দলটাই হল শূদ্রদের দল। কাজের ধারা বদলে গেছে। গতি বদলে গেছে। তার সঙ্গে তাল রেখে তৈরি হয়েছে নতুন ছন্দ।

সেদিন যেমন একদল গোঁড়া লোক অনুষ্টুপ্‌ ছন্দকে 'কুলিমজুর' বলে ঠাট্টা করেছিল, আজও তেমনি একদল গোঁড়া লোক ঠিক একই ভাষায় নতুন জীবনের ছন্দকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু অনুষ্টুপ্‌ ছন্দকে যেমন সেদিন ঠেকানো যায়নি, তেমনি আজও নতুন যুগের ছন্দকে ঠেকানো যাবে না।

॥ এগিয়ে চলো ॥

নাঃ, তোমাকে বড্ডো দেরি করিয়ে দিলাম। ছন্দের পালা শেষ করে চল এবার আসনে বসা যাক। ভয় নেই, বাড়ি ফেরার সময় তোমাকে বড় একটা ছাঁদা বেঁধে দেব।

কিন্তু উঠোন পার হবো কেমন করে বলো তো? মনে মনে ভাবা যাক

উঠোন পার হয়ে গিয়ে আসনের ওপর বসেছি। আসনে বসাটা হল আমাদের অভিপ্রায়, আমাদের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ ছন্দ।

উঁহু, আসন তো মিললো না, উদ্দেশ্যটা তো হাসিল হল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অভিপ্রায় থেকেও ছন্দ হচ্ছে না। শুধু উদ্দেশ্যটা ছন্দ নয়।

আসনে পৌছতে গেলে উঠোনে পা দিতে হবে। আচ্ছা, পা রাখলাম মাটিতে। মাটিতে পা বাঁধছি—বেঁধে দেওয়াই হল ছন্দ। কিন্তু কই? আসন তো মিলছে না। তাহলে শুধু উদ্দেশ্য আর বাঁধন থাকলেই ছন্দ হয় না।

শুধু মাটিতে পা রাখলেই চলবে না, পা ছাড়িয়ে নিতে হবে। ছেড়ে বাঁধলে তবেই হবে ছন্দ। একবার ছাড়া, আর একবার বাঁধা! বেশ, তাই করছি। কিন্তু কই? যেখানে ছিলাম, সেখানেই তো দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছি।

ওকি! তুমি অত চটে উঠলে কেন? তুমি ভাবছ, আমার ক্ষিধে পায়নি? শুধু শুধু ছন্দ নিয়ে খেলা করছি? আহা, দাঁড়াও না—আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

একেই বলে টান। উদ্দেশ্যটা যদি দায় না হয়ে তাতে প্রাণের টান থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠোকা অসম্ভব। তখন যেতেই হবে। আর যাওয়াটা হবে তখন আনন্দের। তখনই হবে পুরোপুরি ছন্দ।

লক্ষ্যের দিকে সানন্দে এগিয়ে যাবার নামই ছন্দ।

চল, যেতে যেতে রোহিতের গল্পটা বলি:

অনেক দিন আগে একদল লোক ছিলো। তাদের পেশা ছিল পশুপালন করা। রোহিতাশ্ব ছিল এমনি একটি দলের লোক। তার বাবার নাম হরিশ্চন্দ্র। রোহিতাশ্ব মানে লাল ঘোড়া। হরি মানেও ঘোড়া। গোটা দলটাই বোধহয় ঘোড়া বলে নিজেদের পরিচয় দিতো।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র রোহিতকে বার বার এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন:

কাজের মধ্যেই আছে মঙ্গল, কাজের মধ্যেই সৌন্দর্য। যে কাজ করে, সেই শ্রেষ্ঠ। কাজের মধ্যেই আছে সুখ। সুতরাং কাজ কর, কাজ কর। যে কাজ করে, তার দেহমন দুই-ই বাড়ে। শ্রমই সমস্ত অভাব ঘুচিয়ে দেয়। সুতরাং কাজ কর, কাজ কর। কাজ করলেই মধু মিলবে, মিষ্টি তুল্‌তুলে ফল মিলবে। দেখ, সূর্যের আলো চলতে চলতে কখনও ঘুমোয় না। সুতরাং, কাজ কর, কাজ কর।

ইন্দ্র কিন্তু গোড়াতেই বলেছিলেন—কাজের এই মাহাত্ম্যটা তাঁর শোনা কথা। তা থেকে মনে হয়, ইন্দ্র নিজে খাটতেন না। খুব সম্ভব ইন্দ্র ছিলেন সেকালকার

একজন দাসপ্রভু। নিজে খেটে নয়, দাসদের খাটিয়েই তিনি অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিলেন। অনেকদিন থেকেই তিনি রোহিতাশ্বকে পাবার জন্যে আড়কাঠি হয়ে লেগেছিলেন। চা-বাগানের কুলি আর লড়াইয়ের পল্টন জোগাড় করার জন্যে যেমন আড়কাঠিরা নানা রকমের মিঠে বুলি আওড়ায়—এও বোধহয় তাই।

ইন্দ্র বলেছিলেন : চরৈবেতি, চরৈবেতি—কাজ কর, কাজ কর। কিন্তু যে কাজ করবে, সে তার কাজের ফলটা পুরোপুরি পাবে কিনা—সে বিষয়ে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। আসলে কাজের ফল তারা পেলে ইন্দ্রের অত বড় প্রাসাদ উঠত না।

ভালো কথা হলেও, কথাটা কার স্বার্থে বলা হচ্ছে, সেটা দেখা দরকার। আজ যখন একদল লোক নিজেরা আরামের মধ্যে থেকে দেশের বাদবাকি লোকদের ঘাড় ভাঙার জন্যে দেয়ালে দেয়ালে ফতোয়া টাঙাচ্ছে ; "আরাম হারাম হ্যায়"—তখন সেটা আর সত্যি থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় জাল। তার মধ্যে ছাঁদ নেই, আছে ফাঁদ।

শুধু পরগাছাদের যেটা পছন্দ, সেটা ছন্দ নয়। যারা খেটে খায়, তাদের যেটা পছন্দ, সেটাই ছন্দ।

যারা শুধু ছন্দের কারিকুরিটাই ছন্দ বলে মনে করে, তাদের ঠাট্টা করে ছড়া কেটে বলা যায় :

বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে।
বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আর বাছে॥

নকল থেকে নাচ

বাড়িতে কান্নাকাটি হৈ-চৈ। একদিনের জ্বরে ছেলেটা মারা গেছে।

সেই ডামাডোলের মধ্যে দুয়োরে এক জাদু-পটুয়া এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, মরা ছেলেটার ছবি এঁকে এনেছে। ছেলেটাকে ও চিনতো নাকি? চেনা দূরে থাক, ছেলেটাকে সে জন্মেও দেখেনি। তাহলে? জাদু-পটুয়ার হাত ভালো। এঁকেছে মন থেকে।

দেখাই যাক কী এঁকেছে সে। হ্যাঁ, মানুষেরই মুখ বটে—তবে ছেলেটার মুখের সঙ্গে কোনোই আদল আসে না।

আর তাও নিখুঁত মুখ হলেও বা কথা ছিল। এ কী এঁকেছে জাদু-পটুয়া? নাক, কান, মুখ আছে—কিন্তু চোখ কোথায় গেল? চোখের মাথা খেয়ে এ কী ছবি এঁকেছে সে!

জাদু-পটুয়াকে তুমি যতটা তালকানা ভাবছ, মোটেই সে ততটা তালকানা নয়। আসলে সে ইচ্ছে করেই চোখদুটো আঁকেনি।

চোখ না থাকায় মরা ছেলেটা পরলোকে বেঘোরে ঘুরে মরছে। ছবি এঁকে সেই খবরটাই জাদু-পটুয়া গেরস্থকে দিতে এসেছে। তাহলে এখন উপায়? উপায় জাদু-পটুয়ারই হাতে আছে। সে যদি ছবিতে চোখ বসিয়ে দেয়, তাহলেই পরলোকে ছেলেটার চোখ ফুটবে।

কিন্তু আঁকো বললেই তো আর সে আঁকবে না। তাকে নগদ দক্ষিণা দিতে হবে। তবেই সে আঁকবে।

তুমি ভাবছ—মরা ছেলেটার চোখ না ফুটিয়ে আগে ওরা নিজেদের চোখ ফোটাক। কেননা চোখ থেকেও ওরা অন্ধ। নইলে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারে ওরা বিশ্বাস করে?

॥ জাদুঘরে জন্ম ॥

কথাটা ঠিকই। কিন্তু মানুষের ইতিহাস যদি একটু খোঁজ কর, দেখবে যে জিনিসটা আজ মানুষের চোখ বেঁধে রেখেছে, এক সময় সেই জিনিসটাই মানুষের চোখ খুলে দিয়েছিলো। সেই জিনিসটা কী? জাদু।

আদিকালের মানুষের কাছে গোটা দুনিয়াটাই ছিল তখন একটা প্রকাণ্ড জাদুঘর। জাদুঘর বলতেই আজ আমাদের মনে হয় যেখানে আছে মরা জিনিসের

কঙ্কাল। পুরনো জিনিসপত্র। অনেক দিন আগে যার আয়ু ফুরিয়ে গেছে, যা ফৌত হয়ে গেছে।

কিন্তু এককালে জাদু বলতে বোঝাত মরা নয়, জ্যান্ত। প্রাণ হারানো নয়, প্রাণ দেওয়া। পুরনো ঝরঝরে নয়, নতুন ঝকঝকে সৃষ্টি। চোখ বোঁজা নয়, চোখ খোলা।

আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো। কড় কড় কড়াৎ। মেঘের আওয়াজটাই হল বাজ। তারপর ঝেঁকে বৃষ্টি। আগে বাজ, পরে বৃষ্টি। বার বার দেখে দেখে আদিম মানুষের মনে কার্যকারণের সূত্রে ব্যাপারটা গাঁথা হয়ে গেল। বাজ আর বৃষ্টির মধ্যে মানুষ খুঁজে পেলো মিল। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি বাজ ধরলেই বৃষ্টি। বাজ ধরবার ফাঁদ হল বাজনা। আর তার কায়দাটাই হল বাজি কিংবা জাদু।

আজ আমরা সমস্ত ব্যাপারটাই বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। কেননা আমরা জেনেছি আওয়াজ নকল করে বৃষ্টি আনা সম্ভবই নয়।

কিন্তু মেঘ থেকেই যে বৃষ্টি আসছে—এটা আন্দাজ করা সে যুগের পক্ষে কম কথা নয়। দুটো আলাদা জিনিসের মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া—সে যুগে এটা যে কত বড় একটা আবিষ্কার, আজ তা আমরা ভাবতেই পারি না। আর শুধু যে জানা, তা নয়—সেই সঙ্গে সেই নিয়মটাকে হাতেকলমে কাজে লাগানোর চেষ্টা। প্রকৃতিকে শুধু জানা নয়, তাকে বদলানো। প্রকৃতিকে বদলাতে গিয়ে নিজেকে বদলানো। এক কথায়, ঠেকে শেখা।

আদিমকালে নকল করে প্রকৃতিকে দখলে আনার চেষ্টার নামই ছিল জাদু। এই নকল করা, জাল করার ব্যাপারটাই ছিল ইন্দ্রজাল।

মানুষের সেই আদিম জাদুঘরে বাজি, নকল, মজা, তামাসা, জাল, মায়া—এর কোনোটারই মানে বাজে, মিথ্যে, ভুয়ো ছিল না। হাত জোড় করে চাওয়া নয়, যেটা চাইছি সেটা পাবার জন্যে হাত লাগানো। কামনাকে ক্রিয়াকর্মে ফুটিয়ে তোলা, গতরটাকে নাড়ানো। এরই নাম ছিল জাদু।

গতর নাড়ানো মানেই গতর নাচানো। হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়। কাজ করা। ফৌত হওয়া নয়। বাঁচা। থেমে থাকা নয়। চলা।

নড়া মানেই যেন নাচা। কাজের মধ্যে নাচের ছন্দটা মানুষের চোখ এড়ায়নি। ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় তার অজস্র নমুনা। যেমন:

জোলা নাচে জুলনী নাচে
নাচে জোলার নাল।

সব চরকি উঠে বলে
আমরা নাচবো কাল ॥

সে এক আলাদা জাদুঘর। সেই আজব জাদুঘরেই জন্ম নিয়েছিলো নাচ, গান, ছবি, ছড়া, ধর্ম আর বিজ্ঞান।

॥ ব্রত আর যজ্ঞ ॥

ব্রত আর যজ্ঞই ছিল· সেই আদিম কালের জাদুঘর। কামনার সঙ্গে ক্রিয়া-কর্মকে জুড়ে ব্রত আর যজ্ঞ গড়ে উঠেছিলো। শুধু চাওয়া নয়, পাবার জন্যে রীতিমত চেষ্টা করা। চাওয়াটা একার নয়। সকলের। একা একা চেষ্টা নয়। সকলে মিলে চেষ্টা।

সমাজে তখন ভাগাভাগি হয়নি। যা কিছুই হোক—হতো সকলের জন্যে আর সকলের চেষ্টায়। সবাই খাটবো, সবাই খাবো। খাবার জোটানো ছিল খুব শক্ত কাজ। সবাই কাঁধ না লাগালে বাঁচবার মত খাবার জুটত না।

আজ আমরা যে অর্থে নাচ বুঝি, সে সময় সে অর্থে নাচ ছিল না। সমাজে যাদেরই খাটবার মুরোদ আছে, তারাই এসে নাচে যোগ দিত। শিকার করা, লড়াই করা, গরু চরানো, ফসল ফলানো যেমন সমাজের সকলের কাজ, তেমনি নাচ-গানও ছিল সামাজিক কাজ, সত্যিকারের বারোয়ারি ব্যাপার। একদল নাচবে, আরেক দল দেখবে—এ রকম নর্তক আর দর্শকের ভাগ ছিল না।

ব্রত আর যজ্ঞে গোড়ায় আদৌ পুরুত-যজমানেরও ভাগাভাগি ছিল না। কেননা ব্রত আর যজ্ঞ বলতে তখন মোটেই পুজো-আর্চা বোঝাত না। ব্রত আর যজ্ঞের জায়গায় জড়ো হয়ে কোনো একটা বিশেষ কামনাকে ক্রিয়াকর্মে নাচ-গানের ভেতর ফুটিয়ে তোলা হত। ঠাকুর-দেবতা, ভজন-পূজন তখন ছিল না। উপসর্গের মতো ওসব পরে এসে জুটেছে।

॥ আসলের নকল ॥

নাচা মানেই হল শরীরের ভঙ্গি দিয়ে কোনো না কোনো ভাব ফুটিয়ে তোলা। হাতে তীরধনুক নেই। তা হলেও শুধু হাতে তীরধনুক ছোঁড়ার ভাবটা নকল করতে পারি। নকল করে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

নকল করার দরকার হল কেন? যা ঘটেছে তা মনে রাখার জন্যে। স্মৃতিটাকে শানিয়ে নেবার জন্যে।

আর কোনো দরকার নেই? আছে। যা ঘটেনি, তা ঘটাতে চাই। অতীত স্মৃতির খুট ধরে আসে ভবিষ্যতের নতুন আশা।

আদিম মানুষেরা দল বেঁধে গেল শিকার করতে। শখ করে নয়, বাঁচার তাগিদে। সারাদিন এ-বন সে-বন ঘুরেও শিকার মিললো না। দুদিন পর এক মস্ত শিকার পাওয়া গেল। শিকার নিয়ে ফিরে এসে গোটা দলটা আগুনের চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে ফুর্তিতে নাচলো। তারা নকল করতে লাগলো কিভাবে দল বেঁধে এক পাল হরিণকে তাড়া করে ঘায়েল করেছে। তখন তারা সত্যিকারের শিকারী নয়, নকল শিকারী। হরিণও তো চাই। তার জন্যে তাদেরই মধ্যে কেউ মাথায় শিং লাগিয়ে সাজলো নকল হরিণ।

কিন্তু জায়গা ছোট্ট। সময় কম। তাছাড়া একেবারে আগা থেকে গোড়া পুরো ব্যাপারটা নকল করলে দুনো খাটুনি। তাতে ফুর্তিটা মাঠে মারা যাবে। কাজেই ঝাড়াই বাছাই করে সংক্ষেপে নকল করতে হবে। হুবহু নকল নয়—যা নইলে নয়, শুধু সেইটুকুর নকল। শিকার করতে গিয়ে যেসব দোষ-ত্রুটি ঘটেছিলো, নকল করতে গিয়ে তা রাখা চলবে না। ভুলগুলো শুধরে নিতে হবে।

॥ সেকালের কথা ॥

এইভাবে যেটা দাঁড়িয়ে যাবে, সেটাই হবে শিকারের নাচ। শুধু একবার নয়, বার বার শিকারে গিয়ে ফিরে এসে বার বার নকল করার ভেতর দিয়ে তৈরি হবে নিখুঁত শিকারের নাচ। সেই নাচই হয়ে উঠবে নতুন শিকারের মহড়া। ফিরে এসে নয়, শিকারে যাবার আগেই গোটা দল একবার নেচে নেবে। নাচের ভেতর দিয়ে দলের সবাই হয়ে উঠবে একমন, একপ্রাণ। শিকারের আবেগ দিয়ে গোটা দলটাকে তারা টান-টান করে বেঁধে নেবে। তারপর যেমনভাবে ধনুকের ছিলা থেকে তীর ছুটে যায়, তেমনি তারা ছুটে বেড়িয়ে পড়বে শিকারের অব্যর্থ সন্ধানে।

গোড়ায় থাকছে নকল, পরে আসছে নক্সা। বাস্তবের ভিত্তির ওপর দাঁড়াচ্ছে কল্পনা। আগে ছিল ছাপ, তা থেকে নতুনের ছাঁচ তৈরি হচ্ছে। শিকারী হচ্ছে নর্তক। জন্তুর বদলে আসছে মুখোশ।

এমনি করে সেদিনের নাচঘরই হয়ে উঠলো সেদিনকার জাদুঘর। নাচ আর জাদুর মধ্যে কোনো তফাত নেই।

দেবতারা সবাই মানুষেরই ছাঁচে ঢালা। যাঁকে আমরা নাড়ুগোপাল বলে জানি, সেই কেষ্ট ঠাকুরও কম বড় নাচিয়ে ছিলেন না। আর শিবঠাকুরের তো কথাই নেই; তিনি নটরাজ।

।। চাষবাসের যুগে ।।

চাষবাসের যুগে নানাদিক দিয়ে মানুষ খানিকটা থিতিয়ে বসলো নতুন সমাজে। নাচের ধাঁচও গেল বদলে। শিকারের বদলে, জন্তু-জানোয়ারের বদলে বড় হয়ে উঠলো ফসলের নাচ। দেখা দিলো পালপার্বণ। সমাজের একদল বাকি সকলের ফসলে ভাগ বসাতে লাগলো। জাদু আর জাদু রইলো না। মন্ত্রগুপ্তির ভেতর দিয়ে ক্রমে তা ধর্ম হয়ে উঠলো। পুরুত-বামুন আর পুজো-আর্চার পত্তন হল। প্রকৃতি আর মানুষের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়ালো দেবদেবী। যেটা ছিল ক্রিয়াকর্ম, সেটা হয়ে উঠলো শুকনো আচার। আস্তে আস্তে কামনা জিনিসটাকেও সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চললো। প্রকৃতির নিয়মটাকে নিয়তি হিসেবে খাড়া করা হল। তার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। যারা ফলের অধিকারী, তারা বাকি সবাইকে বললো—কাজ করে যাও, কিন্তু ফলের আশা কর না।

সে-যুগে যে দলের সর্দার, সে নাচেরও সর্দার ছিল।

আমাদের দেশে বৈদিক আমলেও ছিল নাচের খুব কদর। মহাব্রত আর অশ্বমেধ যজ্ঞে রীতিমত নাচ হত। শুধু যে ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব আর কিন্নরীরা নাচত তাই নয়, ইন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন সেরা নাচিয়ে।

পুরনো যুগে নাচ বলতেই বোঝাত জাদুর নাচ। কাজেই দলের সর্দার, নাটের গুরু আর জাদুকর হত একই লোক। যেমন, ইন্দ্র।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ব্যাপারটা হঠাৎ রাতারাতি ঘটেছে। এ-দল আর ও-দলের মধ্যে কোথাও খোলাখুলিভাবে কোথাও বা ভেতরে ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে সমানে লড়াই চলেছে। তাই দেব-দেবীহীন পুরুতশূন্য ব্রত আজও এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে টিঁকে আছে। বাইরের দিকে রং লাগিয়ে ভেতরটা বদলানো যায়নি।

ওপর তলার মানুষেরা হাতের কাজকে হেয় করে সমাজে এনেছে জাতের বালাই। কাজের সঙ্গে নাচের নিকট সম্পর্ক। নাচও তাই তাদের কাছে হয়েছে ছোটলোকের ব্যাপার। নট সম্প্রদায়কে তারা সমাজের একদম নিচু-তলায় ঠেলে পাঠিয়েছে। নাট বলতে বোঝায় নাচ। কিন্তু নাটা বলতে আজ আমরা বুঝি খাটো, বেঁটে, অপটু। নাটা কথাটাকে খাটো করার ব্যাপার ওপর-তলার লোকেদের চক্রান্তেই ঘটেছে কিনা কে জানে? সত্র বা ছত্র থেকেই কি ছত্রিশ কথাটা এসেছে? ছত্রিশ জাত বলতেই হীন বোঝায়। বামুন ছাড়া সমাজের বাকি সবাই হলো ছত্রিশ জাত। অর্থাৎ, বামুনরা সমাজের মাথায় বসে সবাইকে বলতে লাগলো ইতর জন।

।। হুকুম নয়, সাধনা ।।

আগে গাঁসুদ্ধ লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে নাচ-গান করে নিজেদের কামনাকে হাতেকলমে ফুটিয়ে তুলতো। নাচ-গানের ব্যাপারটা শখশৌখিনতা ছিলো না। আমরা এক—সকলের মধ্যে এই বোধটাকে নাচের ভেতর দিয়ে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলা হতো। ফসল বোনার আগে, ফসল কাটার আগে সকলে মিলে নাচতো। আলাদা আলাদা কাজগুলোকে পরের পর একসঙ্গে গুছিয়ে নেওয়া হতো। সেপাই-পল্টনদের চাঁদমারি আর কুচকাওয়াজের মতো নাচ ছিলো কাজের মহড়া।

জাদুর মধ্যে ছিলো আসলের নকল। ক্রমে আসলের চেয়ে নকলের ওপরই বেশি জোর পড়তে লাগলো। কামনার চেয়ে ক্রিয়া-কর্মই হলো প্রধান। জাদুর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠলো জাদুকর। দলের চেয়ে বড় হয়ে উঠল দলপতি। দশের চেয়ে বড় হল এক।

যে ছিল নাচের সর্দার, দল থেকে নিজেকে সে আলাদা করে নিল। দাঁড়িয়ে না থেকে সে বসে পড়ে হাতমুখ নাড়াতে লাগল। ক্রমে সেই বসে-পড়া নাচের সর্দার হল ঘণ্টা-নাড়ান পুরুতঠাকুর। প্রকৃতির ওপর হুকুম খাটানর বদলে প্রকৃতিকে তোয়াজ করার ব্যাপার এসে গেল।

গোড়ায় হয়ত বলা হচ্ছিল :

নেবুপাতা করঞ্চা। হে বৃষ্টি, ধরে যা ॥

পরে লোভ দেখিয়ে বলা হতে লাগল :

আয় বৃষ্টি হেনে। ছাগল দেব মেনে ॥

।। ঠাঁই-নাড়া ।।

যে যুগে মেয়েরা ছিল সমাজের পাণ্ডা, তখন জাদুর ওস্তাদরাও ছিল মেয়ে। পরে লাঙল দিয়ে চাষ হতে লাগল, তখন পুরুষরা হয়ে উঠল সমাজের প্রধান। তখন থেকে 'ডাইনী' কথাটা সাংঘাতিক নিন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অথচ ডাইনী মানে সত্যিই খারাপ নয়। জাদু, নাচ, কাজ—সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল দক্ষ, দক্ষিণ অর্থাৎ ডান। কিন্তু পরের যুগে পুরুষেরা কিভাবে মেয়েদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়লো 'বামা' কথাটা থেকেই তা বোঝা যায়। মেয়েদের নাম বদলে হল বামা। আজও পুজোপার্বণে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের ডান হাতের ব্যবহার নেই। পুরুষরা প্রধান হয়ে হয়ত মেয়েদের দক্ষতা ভাঙার জন্যেই ডান হাতটা অচল করে

দিয়েছিল। যেমন করে ইংরেজদের হাতে কাটা পড়েছিল এদেশের তাঁতীদের বুড়ো আঙুল। যারা ছিলো, একদিন নটী, নাটুয়া—তারাই কি পরে হল নাটা?

ক্রমে নাচ হয়ে গেল দেখার ব্যাপার। একদল নাচবে, বাকি সবাই দেখবে। নাচিয়ের দলটাকে আস্তে আস্তে গ্রামের বাইরে ঠেলে দেওয়া হল। মঠমন্দিরে, পালপার্বণেও তাদের ঠাঁই থাকল না। নট, রজক, বাজিকর, ভাট, চারণ—এরা হল একদম নিচু জাত। নাট বা নাচ জিনিসটাকে সামাজিক কাজ থেকে ছেঁটে দিয়ে ঠাট আর ঠাট্টা করে তোলা হল।

সমাজে নাচ দুভাগ হয়ে গেল। একভাগ তলানি হয়ে পড়ে থাকল নিচের তলায়। সমাজে তার কোন কদর থাকলো না। অন্য ভাগটা উঠে গেল দেব-দেউলের উঁচু মণ্ডপে। যার নাম হলো—নাটমন্দির। নাটমন্দিরে চলল দেব-দাসীদের নৃত্য। সে নাচে সাধারণ মানুষ জায়গা পেল না। মন্দিরে ঢোকবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অস্পৃশ্য সাধারণ মানুষ সে নাচ দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হল। দেবদাসীরাও সমাজের চোখে খাটো হয়ে গেল।

পরের যুগে যখন রাজা-জমিদারের দল সমাজে প্রধান হয়ে উঠলো, নাটমন্দির খালি করে নাচ চলে গেল রাজসভায়। দেবদেবীকে খুশি করার চেয়ে নেচেকুঁদে রাজা-জমিদারদের খুশি করার ব্যাপারটা বড় হয়ে দাঁড়াল। যা ছিল গোড়ায় আসলের নকল, ক্রমে তা আসল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে হয়ে উঠল ঢং-সর্বস্ব কালোয়াতি।

॥ মনে পড়ে ॥

সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নাচ একেবারে মুছে গেল না। গান-বাজনার মধ্যে, ব্রতের মধ্যে, খেলার মধ্যে, পুজোপার্বণের মধ্যে বর্ণচোরা হয়ে টিকে থাকলো নাচ।

ব্রতের ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় অজস্র নাচুনে ছন্দ। পড়তে পড়তে মাথা না দুলিয়ে পারা যায় না। যেমন:

সাগর! সাগর! বন্দি,
তোমার সঙ্গে সন্ধি॥
রাম আসেন, লক্ষ্মণ আসেন, আর আসেন নল।
তাই দেখে থেমে থাকবেন সমুদ্রের জল॥
ভাই গেছেন বাণিজ্যে—
ফিরে আসবেন আজ।
বাপ গেছেন বাণিজ্যে—
ফিরে আসবেন আজ॥

বাংলায় 'লাচাড়ি' ছন্দ নাচ থেকেই যে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আজও বিয়েসাদির সময় গ্রামদেশে মেয়েরা দল বেঁধে জল সাধতে যায় আর সেই সঙ্গে গায়ঃ

কাৎলা মেঘে হুড়ুম-হুড়ুম
সিঁদুরী মেঘে পানি গো।
সেই পানিতে ভেজে মোর
জননী মার ডুলি গো।

'বাঘাইর বয়াত' শুনতে শুনতে যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় একদল লোক গোল হয়ে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচছেঃ

আইলামার, আইলামার
আইলামার ভাই অরণে। লক্ষ্মীদেবীর চরণে॥
লক্ষ্মীদেবী দিলাইন বর। চাইল কড়াই বাহির কর॥
চাইল আনিয়া দিলাম কড়ি। তারে করব লড়িদড়ি॥
লড়িদড়ি শ্যামার। সোনার মুকুট রানীর।
সোনার মুকুট, রূপার খিলা।
ঐ ঘরখান দেখতে ভালা॥
গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড় কাটুনি।
মাইয়া বড়ো টিটুনি॥
কেন গো মা বিরস বদন। আমায় দিবি কত ধন॥
আমি তো মাগিয়া খাই। বাঘাইর বয়াত গাই॥
বাঘাই গেছে নাগাইপুর। আমার বাড়ি মথুরাপুর।
আইতে যাইতে অনেক দূর। মধ্যে একটা সমদ্দুর॥

নাচের মধ্যে মাঝে মাঝে হৈ হৈ, হায় হায়, আহা, হ্যাদে, ভাই, রে, হে এবং এই ধরনের আরও অনেক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কাজ করার সময় মানুষ মুখে যেমন আওয়াজ করে, ওগুলো সবই তা থেকেই এসেছে।

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রে মাঝিরা নৌকো ছাড়ার সময় ডাকে আলি-আলি-আলি। রাস্তার দুরমুশ ঠুকতে ঠুকতে একদল লোক আওয়াজ করে বলে হেঁই-ও। রাখাল মাঠে গোরু চরাতে চরাতে অদ্ভুত সুর করে ডাকে উ-অ। ডাকগুলো সব সময় এক রকমের নয়। কাজের যেমন যেমন ধরন, ডাকটাও সেই হিসেবে বদলে যায়।

সাপের হিস্ হিস্ শব্দ আর সাপুড়ের মুখের আওয়াজ কিভাবে মন্ত্রের মধ্যে মিলেছে দেখোঃ

আল বিষ কাল বিষ পরাণ বিষ।
কাটি যায় নাশ পাশ শরীষ শরীষ॥
হাড়বন্ধ দ্বারবন্ধ পীর্তিকার লোহবন্ধ।
জ্ঞান কাটুম কুজ্ঞান কাটুম, কাটুম সব সন্ধ॥
যত দূরে যায় বৃক্ষ অশ্বত্থের ছায়া।
ততদূর জান্ব ভাই বাসুদেবের মায়া॥
ধার্মিক লোকে আজ্যে গাছটি পাপী লোকে কাটে।
হাথ ভড়ি কাটিয়া তার ফেলিল পখুরির ঘাটে॥
এবে খেলান ভাল খেলা খেলে
পদুমা খেলা খেলে রাজার ঝিয়ে আ আরে হা।

॥ নাচ আর খেলা ॥

নাচ আর খেলার মধ্যে খুবই মিল দেখতে পাওয়া যায়। হা-ডুডু খেলাটা দেখলেই মনে হবে লড়াইয়ের নাচ থেকে এসেছে। তেমনি গোল্লাছুট খেলার মধ্যে সেই যুগটা যেন ধরা আছে, যে যুগে মানুষের প্রধান পেশা ছিল জন্তু-জানোয়ারের রাখালি করা। গোল্লাছুট খেলার ছড়ায় তার নমুনা পাওয়া যায়:

ছি তোকে করছে কে।
ঘণ্টার আগে দাবড়াইছি॥
ঘণ্টার আগ বইর‍্যা বাঁশ।
ফেইছা মারুম ঝাঁকে ঝাঁক॥
আমার খেল মরে নাই রে বাক্সা বনে আছে।
তিন চার রাখালে তার পানি যোগাইতেছে॥
আমার খেল মারিলি।
কোথায় নিয়ে গাড়িলি॥
শিয়ালে শকুনে খায়।
গন্ধে গন্ধে পরান যায়॥

কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন কথাও কিভাবে ঢুকে গেছে দেখো:

হরতনি ধরতনি খঞ্জনি পায়।
চৌধুরী মশাই পান খেলায়॥
পান খেলাইতে নাগরী।
সোনাবান্ধা পাগড়ী॥

॥ নাচ থেকে ॥

আজ যখন আমরা কবিতা পড়ি, তখন মনেই হয় না নাচ থেকেই এসেছে কবিতা। কিন্তু কবিতার ছন্দ শরীরের মধ্যেও দোলা আনে। পড়তে পড়তে কখন যে আমাদের হাত নড়তে থাকে, তালে তালে পায়ের পাতা নড়ে ওঠে খেয়ালই থাকে না।

নাচের সঙ্গে গোড়ায় ছিল অস্পষ্ট ছাড়া-ছাড়া আওয়াজ। সেই আওয়াজ ক্রমে স্পষ্ট কথা হয়ে ফুটে উঠলো। সেই সুরেলা কথাই হল গান। গান থেকে সুর আর কথা ক্রমে আলাদা হয়ে গেল। সুর থেকে হল কণ্ঠসঙ্গীত আর যন্ত্র-সঙ্গীত। কথা থেকে হল কাব্য আর নাটক।

সাধারণ মানুষ তাই বলে নাচের কথা কখনও ভোলেনি। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে বার বার নাচের কথা মনে করেছে। নাচ বলতে তামাসা নয়, খেলা নয়। নাচের সঙ্গে কাজের নিকট-সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যেই আজও লোকে বলে ঃ 'নাচের পা থামে না', 'নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ', 'নাচে ভালো পাক দেয় মন্দ'। এমনি আরও কতো কী।

নিজেরা না বলে বার বার লৌকিক দেবতাদের মুখ দিয়ে নাচের গুণগান করা হয়েছে। চণ্ডীঠাকুরকে দিয়ে বলানো হয়েছে—ধূপধুনো মন্ত্রতন্ত্র নয় ঃ

"নাট-গীতে করো মোর পূজার স্বজন"।

নাচের এমনি জাদু।

গানবাজনা

তুমি কি যখন-তখন যেখানে-সেখানে যা-তা সুরে গান গাও? তাহলে পুরাণের এই গল্পটা মনে রেখ।—

গানবাজনা শিখে নারদের একবার ভারি অহঙ্কার হয়েছিল। ধরাকে সরা জ্ঞান করে তিনি বেপরোয়াভাবে বীণা বাজাতে লাগলেন।

একদিন নারদ রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন হাড়গোড়ভাঙা একদল লোক তাল-গোল পাকিয়ে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। নারদ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে, বাছা? আহা, কে তোমাদের এমন দশা করলো?'

তার উত্তরে তারা বললো, 'আমরা হলাম রাগরাগিণী। নারদ নামে এক আনাড়ি বীনা-বাজিয়ের হাতে পড়ে আমাদের এই হাল হয়েছে।' নারদ তখন নিজের ভুল বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন।

গল্পটা শুনে তুমি যদি বেজায় খুশি হয়ে ভাবো, বেসুরো গান গেয়ে অমুকের ঠ্যাং এবার ভেঙে দেবো—তাহলে সত্যি সত্যি ঠ্যাং ভাঙতে পারবে কিনা জানি না। তবে এটুকু বলা যায় যে, তাতে পাড়াপড়শীদের হাতে তোমার নিজের ঠ্যাং খোঁড়া হবার ভয় আছে।

।। থাকা না থাকা ।।

সুরের সঙ্গে দেহের একটা যোগ আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সুর মানেই হল শব্দকে খেলানো। তেমন জোর শব্দ হলে কানের পর্দা ছিঁড়ে না যাক, কানে যে তালা ধরতে পারে—সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয় তোমাদের আছে। না থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

সুর শুনে অনেক সময় আমাদের রোমাঞ্চ হয়। শাদামাটা করে বললে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। আবার সুর শুনে কখনও আমাদের চোখ বুজে আসে।

সুর জিনিসটা তাহলে নেহাত ফ্যালনা নয়। তাই বলে দীপক গাইলে আগুন জ্বলে ওঠে, মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি নামে—এসব কিন্তু একদম বানানো গল্প। কোন একটা সত্যি জিনিসকে ফোলালে ফাঁপালেই সেটা মিথ্যে হয়ে যায়। বেশি কচলালে লেবু যেমন তেত লাগে।

। পৃথিবীতে বাসা ॥

কেননা তা যদি হত, তাহলে মাঠে গিয়ে সবাই মিলে গান গাইলেই ফসলে গোলা ভরে যেত—কষ্ট করে বীজ বুনতে আর ধান কাটতে হত না।

যখন আমরা বলি গানের চমৎকার মিষ্টি সুর—তখন আমরা সুরটাকে চোখে দেখে চমৎকার কিংবা চেখে দেখে মিষ্টি বলি, এমন নয়। দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, গন্ধ নেই—কিন্তু শোনা যায়। সুর আছে বলেই শোনা যায়। সুর যখন না থাকে তখন কি আমরা সুর শুনতে পাই? নাকমুখ বন্ধ করে গলা দিয়ে সুর বার করার ক্ষমতা কারো নেই। তেমনি হারমোনিয়ামটা যখন মেঝেতে পড়ে থাকে, যখন কেউ তাতে হাত লাগায় না, তখন তা থেকে সুর বার হওয়া সম্ভবই নয়। যা থেমে থাকে, তাতে সুর নেই।

গতি না থাকলে সুর হতেই পারে না। গান কিংবা গৎ—দুইয়ের মধ্যেই আছে গতি। আর গতি বললেই বুঝতে হবে কোন কিছুর গতি। বস্তুরই বিশেষ একটি গুণ হল গতি। একটা বল তুমি এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে দিলে। বলটা হল বস্তু; বলের গড়িয়ে যাওয়াটা হল বলের গতি। কিন্তু কেউ যদি বলে, বল না থাকলেও বলের গতি থাকা সম্ভব—তাহলে তাকে আষ্টেপৃষ্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে বলা যায়, এবার একটু ছুটে এসো তো, চাঁদ।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, সুর জিনিসটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অতীন্দ্রিয় কোন ব্যাপার নয়—পৃথিবীতেই তার বাসা। তাই কলের গানে, তারে-বেতারে তাকে ধরা যায়।

আওয়াজকে নিয়মে বাঁধলে হয় সুর। সুরেলা কথাই হল গান।

॥ সুরের স্রষ্টা ॥

একদিক থেকে মনে হবে, মানুষ ভারি বিনয়ী। যে গৌরব তার একার পাওনা, সেটা সে দেবতার হাতে সঁপে দেয়। বলে, মহাদেবের প্রণবধ্বনি থেকে সুরের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মহাদেব যে মানুষেরই মনগড়া, সে খবরটা লুকনো থাকে। বিশেষ অবস্থায় নিজেকেই মানুষ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেবতা করে তুলেছে। আর মানুষের গুণগুলোই প্রকাণ্ড করে দেবতার ওপর চাপিয়েছে।

কাজেই অন্যদিকে আবার মনে হবে, মানুষ বেজায় অহঙ্কারী। যেটা তার পাওনা নয়, সেটাও সে দেবতার বেনামীতে নিজের করে নিয়েছে। সুর তো প্রকৃতি থেকেই এসেছে। যখন মানুষের জন্মও হয়নি, তখনও প্রকৃতিতে সুর ছিল। নদীর কুলু কুলু শব্দে, পাখির গলায়, বাতাসে-কেঁপে-ওঠা গাছের পাতায় গান ছিল। কাজেই গান গেয়ে মানুষের গুমর করবার কিছু নেই।

যে যাই বলুক, সুর কিন্তু মানুষেরই সৃষ্টি। প্রকৃতি হাজার চেষ্টা করলেও দু কলি গান গেয়ে শোনাতে পারবে না। ঝাউগাছ তার পাতায় সাঁই সাঁই আওয়াজ না করে জলের কুলুকুলু আওয়াজ তুলুক দেখি? পারবে না। মানুষ

নিজের খুশিমতো সুর বানাতে পারে। দুঃখে তার এক সুর, আনন্দে তার অন্য সুর। সুরের ওপর তার দখল আছে। তাই সুকণ্ঠের জন্যে কোকিলের যতো নামই থাক, গানের আসরে কোকিলকে বসিয়ে দিলে—আসরে একটি লোকও বসে থাকবে না। কারণ, কোকিল শুধু একঘেয়ে ডেকে যাবে। কোকিল গান গায় না—ডাকে। ওটা তার স্বভাব। যেটা স্বভাব, সেটা সৃষ্টি নয়। স্বভাবকে বদলানোর নামই হলো সৃষ্টি।

মাটির নিচে ধুলোময়লার মধ্যে মিশে থাকাই লোহার স্বভাব। লোহা তৈরি করতে গেলে লোহার সেই স্বভাব বদলাতে হবে—তাকে মাটি থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। সে কাজ শুধু মানুষই করতে পারে।

॥ কোথা থেকে এলো ॥

তেমনি প্রকৃতির মধ্যে যে সুর আছে, সেই সুর ছাড়িয়ে এনে তাকে ভেঙেচুরে মানুষ নিজের গলায় এবং যন্ত্রে বেঁধেছে।

এক সময়ে দল বেঁধে তালে তালে কাজ করতে গিয়েই মানুষের মুখে বুলি ফুটেছিল। সেই বুলি থেকেই কথা আর সুরের জন্ম।

নাচের সময় যেটা ছিল হাততালি, পরে সেটা বদলে হয়েছে বাজনা। যেটা ছিল-হৈ-হল্লা, সেটা পরে বদলে হয়েছে গান। শুধু দল বেঁধে নয়, পরে মানুষ একা একা গাইতে বাজাতে শিখেছে।

ছাড়া ছাড়া আওয়াজ কিভাবে মীড় আর মূর্ছনা হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। একদল বলেন, শোক থেকে সুরের জন্ম। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা দেখান—অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতির মানুষেরা সন্ধ্যে হলে মৃতদের জন্যে সুর করে কাঁদে। গ্রীসেও এই ভাবে কাঁদবার রেওয়াজ ছিল। আমরা যে কাঁদুনি গাওয়ার কথা বলি, তার পেছনেও এরকম ইতিহাস থাকা অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশে পুরাণে বলা হয়, শোক থেকেই নাকি শ্লোকের জন্ম। বাল্মীকি নাকি ক্রৌঞ্চমিথুনের শোক দেখে শ্লোক রচনা করেছিলেন। তবে আমাদর দেশে মেয়েরা যখন শোকে কাতর হয়ে কাঁদে, সেই কান্না দূর থেকে গানের মতই শোনায়। তার মধ্যে অনেক সময় কথা কম থাকে কিংবা অনেক সময় কথার ভেতর দিয়ে গাথার মতো কাহিনী বলা হয়ে থাকে।

॥ ডাক নকল ॥

ইটের তৈরি প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদের পাশে মাটির তৈরি ঘর থাকলে—দেখে মনেই হয় না দুটো একই জায়গা থেকে এসেছে। অথচ দুটোই মাটির তৈরি।

কাঁচা মাটি আর পোড়া মাটি। তাহলে আসলে তফাত দুটোর প্রকৃতিতে নয়। সেই প্রকৃতিকে মানুষ কতখানি বদলেছে, তার মধ্যে কতখানি হাত লাগিয়েছে— সেটাই হলো দেখবার ব্যাপার।

আমাদের দেশের পুঁথিপুরাণের মতে, সপ্তস্বর নাকি সাতটি জানোয়ারের ডাক থেকে এসেছে। ময়ূর থেকে সা, ষাঁড় থেকে রে, ছাগল থেকে গা, বক থেকে মা, কোকিল থেকে পা, ঘোড়া থেকে ধা, হাতি থেকে নি। পুঁথিপুরাণে জন্তু-জানোয়ারের নাম নানা কারণে এসেছে। অনেক সময় জন্তুজানোয়ারের নামে মানুষ বোঝানো হয়েছে। সে যাই হোক। নাচের মধ্যে যখন মুখোস পরে জন্তু-জানোয়ারের ডাক নকল করা মোটেই অসম্ভব নয়।

বছর কয়েক আগে মধ্য প্রাচ্যে উর নামে একটি জায়গায় পাঁচ-ছ হাজার বছর আগেকার তারের একটি বাজনা পাওয়া গেছে। তার মাথার দিক এবং তলার দিক ষাঁড়ের মতো করে তৈরি। তাতে লেখা আছে, এই বাজনার সুর ষাঁড়ের আওয়াজের মতো। আরও যেসব বাজনা পাওয়া গেছে, তার প্রত্যেকটাতেই কোনো না কোনো জন্তুজানোয়ারের মূর্তি।

বাজনায় ডাক নকল করার ব্যাপারটা আজও আমাদের দেশে দেখা যায়। অনেক সময় ঢাকের গায়ে মেঘ ডাকানো, একতারায় কথা বলানো হয়। তাছাড়া, যারা হরবোলা তারা তো তাদের গলা দিয়েই রকমারি আওয়াজ নকল করতে পারে।

॥ সুরের জাদু ॥

সুরের সঙ্গে জাদুর আছে নাড়ীর যোগ। গানই ছিল আগে মন্ত্র। শুধু যে সুর করে মন্ত্র বলা হত, তাই নয়—সুরের একটুখানি এদিক-ওদিক হলে ফল নাকি উল্টো হয়ে যেত। এ থেকে বোঝা যায়, সুর ছাড়া জাদু হতো না।

আমরা সাপুড়েদের মুখে যে মন্ত্র শুনি তাও গান ছাড়া কিছু নয়। যেমন :

কুসডিডিপের মাঝে আছে সুধাতরঙ্গিনী
রিনিঝিনি বএ পানি ভেটিএগা উজানি।
তার মধ্যে বাঁশঝাড়টি তিন ঠাঞি তার বাঙ্কা
ছিরকাল বৈস্তে তায় ধুকুড়িয়া কাঁখা।
ছিরকাল বৈস্তে কাগ করে সাঞি সাঞি
যা রে হরের বিষ ত্রিভুবনে নাঞি॥
পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডুবিয়া ধরে মাছে
ডুমুনি ফুকুরে কান্দে সমুদ্রের মাঝে।

জলে নাচে জলে গায় জলে ধরে তাল
যা রে হরের বিষ ই সপ্ত পাতাল ॥

কিংবা

হস্ত সারম্ গলা সারম্ আর সারম্ মুখ।
পেট পিঠ চরণ সারম্ আর সারম্ বুক।
পেট পিঠ চরণ সাতি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে।
কাঙরের কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর।
বালির বিন্দ রাজা বলে অমুক হৈলা অমর ॥

দলবদ্ধ নাচের গোড়া বাঁধা হয়েছিল যেমন দলবদ্ধ কাজে, তেমনি গানেরও গোড়ায় ছিল কাজ। মান্ধাতা আমলের যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে মানুষ প্রথম কাজে নেমেছিল, তারই ঠুংঠাং ঠুকঠাক শব্দে মানুষের হাতে বেজে উঠেছিল প্রথম স্বর। সেই শব্দগুলোকে আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলে, নানাভাবে খেলিয়ে, মানুষ নিজের মত করে গড়ে তুলেছে স্বর।

॥ কাজের কথা ॥

শুধু গানের বাইরের দিকটা নয়, ভেতরের বলবার কথাটাও জীবন থেকেই উঠেছে। কাঠমিস্ত্রির 'ঘুণ্ ঘুণ্ ঘুণায় নমো'র মধ্যে যন্ত্র এবং মন্ত্র দুটোই ধরা পড়েছে।

বাংলার ফকির-বাউলদের গান আমরা যতোটা আধ্যাত্মিক বলে মনে করি, আসলে তা অতোটা আধ্যাত্মিক নয়। যারা গায় এবং যাদের মধ্যে গায়, তারা সবাই গ্রামের সাধারণ মানুষ। যে তত্ত্বের কথা বাউলদের মুখে শোনা যায়, তার মধ্যে ঠাকুর-দেবতার আমদানি হয়েছে পরে। এর মধ্যে এমন সব ইশারা আছে, যা থেকে মনে হয় এক সময় এগুলো জাতব্যবসার গান ছিল। যে বেদে-বেদেনীরা ওঝা কবিরাজি আর ঝাড়ফুঁক করতো, যে ডোম-ডুমুনীরা বেত আর চামড়ার কাজ করত, যে মাঝি-মাঝিনীরা মাছ ধরত আর নৌকো বাইত—এক সময় এসব তাদেরই গান ছিল। সাঁই, গোসাঁই, গুরু—এরা ছিল জাদুকর-পুরুত এবং দলের সর্দার।

দেহতত্ত্বের গানে আছে বত্রিশ নাড়ী আর নানা রকম নল নলীর কথা। আমাদের দেশে শুধু গাছগাছড়ার ওষুধ নয়, নানা রকম যন্ত্র দিয়ে অস্ত্রোপচার এবং শবব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে হাড়ি-ডোম-বেদের দল সিদ্ধহস্ত ছিল। ঝাড়ফুঁক, নল চালানোর ব্যাপার তো এখনও চলে। বাংলার প্রাচীনতম চর্যাগানেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই যখন বাউলের গান শুনি :

কারখানা দেখে এলাম দমঘরে।
হিনলে আর মির্নলে স্থকনলে আর কর্নলে
তাদের জনম পশুর মত চারজনা এক রং ধরে
চার জনা চার ধারা বয়, সাধককে তা খুঁজে নেয়
পুশিদার সব জানা যায় যে যেমন উড়িতে পারে॥

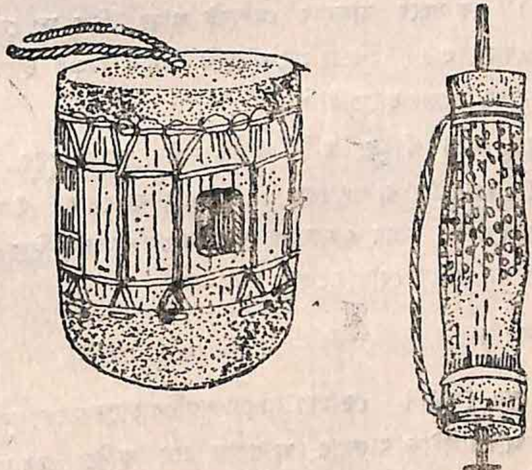
আগে যা ছিল কাজের কথা, পরে তাই দিয়ে রহস্য তৈরি করা হয়েছে :

ও তুই দিন থাকতে গুরু চাঁদকে
উঠা নৌকার পর।
নইলে রৌদ্র উঠে যাবে চটে
শেষে দোহাই দিবি কার॥
ছয় বোম্বেটে আছে নেয়ে
তারা আস্তে আস্তে নেবে বেয়ে
তোরে ছেড়ে দিবে ঘোলায় নিয়ে
কেন্দে কেন্দে কূল পাবি না আর॥

॥ যন্ত্র আর বাজনা ॥

একেবারে গোড়ার দিকে, যেমন কাজের টানে গান, তেমনি বাজনাও এসেছিল।

যে সব যন্ত্র নিয়ে আদিম যুগের মানুষ কাজ করত, সেইসব যন্ত্রের কিছুকিছু যে চেহারা বদলে বাজনা হয়েছিল : নিচেকার ছবিগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে।



আজও পৃথিবীতে যেসব মানুষেরা আদিম অবস্থায় আছে, তাদের মধ্যে

বাজনার খুব বেশি প্রচলন দেখা যায় না। যেমন চুকচিদের মধ্যে আছে শুধু একরকমের তালঠোকার যন্ত্র। কাজ করার যন্ত্র তেমন বাড়েনি বলেই বাজনার যন্ত্র এতো পিছিয়ে আছে।

বাজনা চার রকমের—তত অর্থাৎ তারে বাঁধা ; বিতত বা আনদ্ধ অর্থাৎ চামড়ায় বাঁধা ; ঘন অর্থাৎ কাঁসার যন্ত্র ; শুষির অর্থাৎ হাওয়ার যন্ত্র।

॥ পেটা ও ঘষা ॥

বিতত এবং ঘন—এই দুইরকমের যন্ত্রই সব থেকে পুরনো। ঢোল হল বিতত, কাঁসি হলো ঘন। এই যন্ত্রগুলো ঠুকে বাজাতে হয়। আদিম কালের মানুষের হাতে প্রথম অস্ত্রই ছিল পাথরের। পাথরে পাথর ঠুকে আগুন পেতে হত। শুধু ঠোকা কিংবা পেটা নয়, ঘষার কাজটাও ছিল বড়। পশু শিকার করে তার চামড়া দিয়ে মানুষ তাই অনেক আগেই বাজনা বানাতে শিখেছিল।

আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে আমাদের দেশের পুরনো পুঁথিতে যেসব নাম পাওয়া যায় তা হল এই : পটহ বা নাগরা, মর্দল বা মাদল, হুড়ুক্ক, আরকট, অঘট, রঞ্জা, ডমরু, ঢক্কা, কডুলি, টুক্কবি, ত্রিবলী, ডিণ্ডিম, ভূমিদুন্দুভি, ভেরী, নিঃসান, তুম্বকী টমকী, মণ্ড, কম্বুজ, পণব, কুণ্ডলী, পাদবাদ্য, শর্কর, মট্ট, মৃদঙ্গ বা খোল, তবলা, ঢোলক, ঢোল, কাড়া, জগঝম্প, তাসা, দামামা, টিকারা, জোরঘাই, খোরদক। এর মধ্যে অধিকাংশই আজ লুপ্তপ্রায়।

বৈদিক যুগেই দেখা যায়, বাজনা বাজানো একটি দলের রীতিমতো পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময়ে বাজনার যে খুবই আদর ছিল, তা দেবতাদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। শিবের হাতে দেখি বিষাণ, বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, সরস্বতীর হাতে বীণা, কৃষ্ণের হাতে বাঁশি।

ঘন যন্ত্রের মধ্যে পড়ে ঝাঁঝর, ঘড়ি, কাঁসি, ঘণ্টা, ঘুঙুর, নূপুর, মন্দিরা, খরতাল, করতাল, সপ্তসরাব বা জলতরঙ্গ। এই সব যন্ত্র লোহা, কাঁসা, কাঁচ ইত্যাদি ধাতু দিয়ে তৈরি। তবে এক সময়ে বোধ হয় বেশির ভাগ ছিল লোহার তৈরি। কেননা 'ঘন' বলতে বোঝায় লোহা।

॥ টানা ও ঠোকা ॥

তারের বাজনাও খুব পুরনো। তোমরা নিশ্চয় ধুনুরির হাতে তুলো ধুনবার যন্ত্র দেখেছ। তার আওয়াজটাও বাজনার আওয়াজ মনে করিয়ে দেয়। ধুনুরি কাঠের যে ডাণ্ডা দিয়ে ঘা দেয়, সেই ডাণ্ডা দেখলে এস্রাজের ছড়ের কথা মনে পড়ে যায়।

গুন-লাগানো ধনুকের মতো যে যন্ত্রটা দেখছ, ওটা এক রকমের বাজনা। কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে আজও তার চলন আছে। আমাদের দেশে এরই নাম 'পিণাক'। পিণাক এবং তারপর একতারা—এই ছুটোই এদেশে সবচেয়ে পুরনো বাজনা।

তারের যন্ত্র বলতে শুধু লোহা কিংবা তামার তার বোঝায় না। ধাতু তৈরির আগে থেকে জন্তুজানোয়ারের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয়ে আসছে তাঁতের যন্ত্র।

আরেকটি যন্ত্র আছে, তার নাম 'আলাপিনী'—এর তার ধাতুরও নয়, তাঁতেরও নয়, তিনগাছি পাট কিংবা কার্পাস সুতো দিয়ে তৈরি।

তত যন্ত্রের মধ্যে পড়ে আলাপিনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লরী, জ্যেষ্ঠা চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, সস্তিকা, কূর্মিকা, কুব্জা, সারেঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিস্বরী, শ্বেততন্ত্রী, নকুলোষ্ঠী, ঠংসরী, ঔড়ম্বরী, পিণাক, নিবঙ্গ, পুষ্কল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্রবীণা, স্বরমণ্ডহ, কপিনাম, মধুস্যন্দী, ঘনা, মহতীবীণা, রঞ্জনী, সারদ, সুরসাব্দ, স্বরশৃঙ্গার, সুরবাহার, নাদেশ্বরবীণা, ভরতবীণা, ডুম্বুরু বীণা, কাত্যায়ণবীণা, প্রসারণী, এস্রাজ, মায়ুরী, একতারা, গোপীযন্ত্র, মোরঙ্গ, আনন্দলহরী। এর মধ্যে অধিকাংশ বাজনাই আজকাল আর দেখা যায় না।







এই সব যন্ত্রের জন্যে দরকার হয় জন্তুজানোয়ারের নাড়িভুঁড়ি, ছাগলের চামড়া, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল, লাউয়ের খোলা, বাঁশ, পাট, কার্পাস, কাঠ, লোহা, পিতল।

॥ ফুঁক যন্ত্র ॥

মুখের ফুঁ দিয়ে বাজাবার যন্ত্রকে বলে শুষির যন্ত্র। এর চারটে ভাগঃ বাঁশি, কাহলা, শিঙা, শঙ্খ। এই যন্ত্রের মধ্যে পড়ে বাঁশি, পার, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাহলা, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, রামশৃঙ্গ, শঙ্খ, ভোড়হী, বুক্কা, স্বরনাভী, আলাপিক, চর্ম-

বংশ, সজলবংশী, রৌশনচৌকী, সানাই, কলম, তূরী, ভেরী, গোমুখ, তুবড়ি, বেণু। বেশির ভাগই এখন লুপ্ত।

শিঙা এবং শাঁখ পশুশিকার এবং লড়াইয়ের কাজে ডাক দেবার জন্যে ব্যবহার হত। খুব সম্ভবত পশুপালন ও চাষবাসের যুগে বাঁশির চলন হয়। শিব আর বিষ্ণুর হাতে শিঙা আর শঙ্খ এবং কৃষ্ণের হাতে বাঁশি দেখে খানিকটা তা আন্দাজ করা যায়।

নানা রকমের বাজনা দেখে বোঝা যায় এর সবগুলো একই সময়ে তৈরি হয় নি। যন্ত্রগুলো তৈরি করার আগে মানুষকে প্রকৃতির কতকগুলি নিয়মকানুন আবিষ্কার করতে হয়েছে। গোড়ায় যেমন-তেমন পাথরই ছিল মানুষের একমাত্র অস্ত্র। তারপর পাথর ঘষেমেজে যখন ছুঁচোলে আর ধারাল হল, তখন মানুষ দুনিয়াকে জয় করার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। আজ পরমাণু ভাঙার যুগে সে কথা ভেবে আমাদের হাসি পায়।

কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্বের তফাতে আওয়াজের তফাত হয়, ছাড়া ছাড়া আওয়াজকে একটানাভাবে বাঁধা যায়, একটানা আওয়াজকে নানা স্বরে খেলান যায়—এসব নিয়ম আবিষ্কার করতে যুগের পর যুগ কেটে গেছে।

আর এই সমস্ত আবিষ্কারের পেছনে আছে সেই সব সীমাসংখ্যাহীন অক্লান্ত মানুষ যারা বাঁচার চেষ্টায় পৃথিবীকে বদলেছে। তাদেরই দৌলতে আজ আমরা আনন্দে গান গাই, বাঁশি বাজাই।

পালাবদলের পালা

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ আমাদের। বারোমেসে গানের দেশ। পাল-পার্বণ নিয়ে কেন যে এত মাথা ঘামানো, এমনিতে বোঝা মুশকিল। শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন, অল্পবিস্তর সব দেশেই দেখা যায় বছরে কতকগুলো বাঁধা সময় আছে, যখন দেশসুদ্ধ লোক উৎসবে মেতে ওঠে।

সময় বাঁধার ব্যাপারটা কিভাবে এল? একেবারে বছরের গোড়া থেকে শুরু করা যাক। যে দিনটা আমাদের নববর্ষ, সেদিন কিন্তু সব দেশে নববর্ষ নয়। সব দেশের পাঁজি এক রকমের নয়। কিন্তু 'এখন আমাদের বৈশাখে বছর শুরু হয় বলে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, চিরদিনই আমাদের বৈশাখে বছর শুরু হয়ে এসেছে।

॥ প্রকৃতির পালা ॥

বর্ষ বলতে আমরা বুঝি বছর। এক সময় জলবৃষ্টির সময় বর্ষ শুরু হতো। তাই থেকেই ঋতুর নাম হয়েছে বর্ষা। আবার হায়ন বলতে বোঝায় বছর। আর অগ্র বলতে বোঝায় আগা। তাহলে অগ্রহায়ণেও বোধ হয় কোন এক কালে বছর শুরু হত। হায়ন মানে আবার ফসল। জলবৃষ্টি আর ফসল—এ থেকে মনে হয় বছর ঠিক করার সঙ্গে এ দুটো ব্যাপারের বিলক্ষণ যোগ ছিল।

বারো মাসের তেরো পার্বণের ভেতর দিয়ে মানুষ সব চেয়ে বেশি করে কী চায়? জলবৃষ্টি, আর ধনদৌলত। আর চায় কোল-জোড়া মানিক। এরই জন্যে মানুষের যত যজ্ঞ, ব্রত আর জাদু। এরই জন্যে যত মাথা কাটা আর মানত করা।

সব দেশে একই সময় খাবার মিলবে, ফসল ফলবে—তার কোন মানে নেই। তাই দেশে দেশে পাঁজির তফাত। এমন কি আমাদের মত বিরাট বড় দেশেও পুজোপার্বণের এবং তার দিনতারিখের অমিল দেখা যায়।

নিজের নাড়ি একবার টিপে দেখ কি রকম তালে তালে চলছে। ক'দিন আগে চাঁদ দেখেছিলে, আজ দেখ, চাঁদ কত রোগা হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও তুমি খালি গায়ে ঘামতে। আর আজ উনুনের পাশে বসে ঠাণ্ডা হাত দুটো গরম করছ। চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি, শীত আর গ্রীষ্ম কি রকম পালা করে আসে। সূর্য সকালে একদিনও উঠতে ভুল করে না।

প্রকৃতির মধ্যে এই পালা-ক্রমে আসা-যাওয়া, ওঠা আর ডোবা—এ থেকেই

এসেছে সময়ের ধারণা। দিন মাস বছরের ভাগাভাগি। পালপার্বণ আর পালাগানের গোড়া রয়েছে প্রকৃতির এই পালাবদলের মধ্যে।

।। পালপার্বণ ।।

তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় পাঁজি আছে। পাঁজির মধ্যে কী লেখা ? অমুক দিন অমুক তিথি। অমুক তিথিতে অমুক পুজো। আর সেই সঙ্গে শুভ-অশুভ, নিষেধ-বারণ, ক্রিয়াকর্মের লম্বা সব ফিরিস্তি। আজও আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই যারা পাঁজির কথা বেদবাক্য বলে মনে করে। রওনা হবার সময় হাঁচি পড়লে তারা ঘরে ফিরে আসে, গ্রহণের সময় গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভাবে পুণ্য হল। ধারণাগুলো হাজার হাজার বছরের পুরনো।

কিন্তু আজকের চোখ দিয়ে সেকালের বিচার একদম অচল। মানুষের জয়-যাত্রার পথে একদিন জাদু ছিল অগ্রগতির বড় একটা ধাপ। এই জাদুযজ্ঞ থেকেই পরে হয়েছে পালপার্বণ। মানুষ তখন ঘরসংসারে ক্ষেতেখামারে থিতিয়ে বসেছে। জীবনের নতুন দরকারে প্রকৃতির পাল্টানে তৈরি হল নতুন এক শিল্প—পালা, যাত্রা, নাটক।

পুরনো ব্রতগুলোই পরে চেহারা বদলে পালপার্বণে দাঁড়িয়ে গেছে। যে ব্রতগুলো আজও টিঁকে আছে, তাতে চাঁদ বেচারীর তেমন স্থান নেই। অথচ রূপকথার চাঁদবুড়ির কোলে জন্তুজানোয়ার, হাতে চরখা। ছড়ার মধ্যে চাঁদের আদরও কম নয় ঃ

আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা দুয়ারে বাঁধা হাতী।
চোক ঢুল্ ঢুল্ নয়নতারা দেখ্‌সে চাঁদের বাজী ॥
চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ, হিঞ্চে বনে শচী।
ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ, চাঁদে মেশামেশি ॥

কিন্তু ব্রতগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে সূর্যকে নিয়ে আদিখ্যেতা। রায় হলেন সূর্য।

রায় উঠছেন, রায় উঠছেন, বড়োগঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে তেল-গামছা ? দাও গো রেয়ের হাতে ॥
রায় উঠেছেন অন্নে। তামার হাঁড়ির বর্ণে ॥

।। সূর্য বড়ো ।।

চাঁদের বদলে সূর্যকে বড়ো করে দেখার ব্যাপারটা এসেছে পরে। আদিম কালের মানুষ গোড়ায় মনে করতো চাঁদের দরুনই পশুপাখি গাছপালা মরে বাঁচে। চাঁদ ছিল তাদের কাছে জাদু-জানা ডাইনী বুড়ি। তিথিনক্ষত্র মাসবছরের কর্তা।

কিন্তু পরে চাষবাসে হাত লাগিয়ে আস্তে আস্তে মানুষ বুঝতে পারলো আসল কর্তা চাঁদ নয়—সূর্য। সূর্য হলেন 'রায়' অর্থাৎ রাজা। এক ঋতু গিয়ে অন্য ঋতু আসার মূলে আছেন সূর্য ঠাকুর। শীতের সময় সূর্যঠাকুরের মৃত্যুদশা। তখন গাছপালা যায় শুকিয়ে, সমস্ত কিছুতে টান ধরে।

কিন্তু মানুষ হাত গুটিয়ে বসে থেকে মৃত্যুকে মেনে নেয় না। সূর্যকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে তুষতুষুলি ব্রত করে। সূর্যকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই কেন ?

কোদাল-কাটা ধন পাবো। গোহাল-আলো গোরু পাবো।
দরবার-আলো বেটা পাবো। সভা-আলো জামাই পাবো।
সেঁজ-আলো ঝি পাবো। আড়ি-মাপা সিঁদুর পাবো।
ঘর করবো নগরে। মরবো গিয়ে সাগরে।

॥ মৃত্যু থেকে জীবন ॥

তুঁষ, গোবর আর খড়কুটো একসঙ্গে মেখে আগুনে পুড়িয়ে তারপর জলে ভাসাতে হবে। আর সেই সঙ্গে আছে ছড়া :

কুলকুলনি এয়ো রানী, মাঘমাসে শীতল পানি।
শীতল শীতল ধাই লো, বড়গঙ্গা নাই লো॥
শীতল শীতল জাগে, রাই বিয়ে মাগে।
আমাদের রায়ের বিয়ে ঝাম-কুর-কুর দিয়ে॥

তোষলার সরায় করে মৃত্যুর যে কুশপুত্তলিকা জলে ভাসানো হচ্ছে, সেটা আসলে সারমাটি—যা নতুন ফসল ফলাবে। মৃত্যুর মধ্যেই আছে জীবন। সূর্যের নাম করে সবটাই আসলে ফসলের ক্রিয়াকর্ম। সে যুগে মানুষ মনে করতো বীজ রোয়া মানেই হল বীজটার মৃত্যু হওয়া—বীজটাকে মাটির নিচে কবর দেওয়া। সেই বীজ থেকে উঠবে অঙ্কুর। মৃত্যু থেকে জীবন। শীত হল মৃত্যু, বসন্ত জীবন।

কুশপুত্তলিকায় মৃত্যুকে পুড়িয়ে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ডাক দেয় :

'উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।'

সূর্যঠাকুর কুয়াশায় চাপা পড়ে আছেন। ডাক শুনেও উঠতে পারেন না। করুণভাবে নিজের অক্ষমতা জানান :

'উঠিতে না পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।'

তখন কুয়াশা ভাঙার কাজে মানুষই হাত লাগায়।

ঠাকুর মানুষের সাহায্য নইলে বাঁচতে পারেন না। তারই জন্যে দরকার হল

মাঘমণ্ডল ব্রতের। এই ব্রতের মধ্যে কিভাবে পালা-গান আর যাত্রার ভাব ফুটে উঠেছে এক নজরে দেখা যাক।

প্রথম অঙ্ক।। প্রথম দৃশ্য

(পুকুরের ঘাট। ভোরের কুয়াশায় চারদিক আঁধার। ঘাটে লাউল ঠাকুর নামিয়ে-দু-দল মেয়ে চোখমুখ ধুচ্ছে আর বলাবলি করছে)

১ম দল। চোখে মুখে জল দিতে কী কী ফুল লাগে?

২য় দল। ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে।

নেপথ্যে। হারে, কী কী ফুলে মুখ পাখালি?

মেয়েরা। ইতল বেতল দুই ফুলে। সরুয়া মরুয়া দুই ফুলে ॥

মালি। সেই ফুলে খান কী?

মেয়েরা। নল ভেঙে জল খান।
যে জল ছোঁয় না রে কাগে আর বগে
সেই জল ছুঁই মোরা দূর্বার আগে।
(সাজি হাতে হাসতে হাসতে মালিনীর প্রবেশ)

মেয়েরা। হাসিস্ না লো, খুশিস্ না লো, তুই তো আমার সই!
মাঘমণ্ডলের বর্ত করুম, ঘাট পামু কই?

মালিনী। আছে আছে লো ঘাট, বামুনবাড়ির ঘাট!

মেয়েরা। রাত পোহালে বামুনগো পৈতা ধোওনের ঠাট।

মালিনী। নাপিতবাড়ির ঘাট?

মেয়েরা। নাপিতগো ক্ষুর ধোওনের ঠাট।

মালিনী। ধোপাবাড়ির ঘাট?

মেয়েরা। ধোপাগো কাপড় ধোওনের ঠাট।

মালিনী। ভুঁইমালির ঘাট?

মেয়েরা। ভুঁইমালিগো কোদাল ধোওনের ঠাট।

মালিনী (হেসে)। মেলেনী বুড়ির ফুল ধোওনের ঠাট।
(মালির প্রবেশ)

মালি। জইৎ গাছে কে, ডাল নামাইয়া দে
সূর্যিঠাকুর চাইছেন ফুল,
সাজি ভরিয়া দে।

মালিনী। আধা গাঙে ঝড়বৃষ্টি, আধা গাঙে মালি

মধ্যখানে পইড়া রইছে জৈৎফুলের ডালি।

মেয়েরা। কৈ যাস্‌লো মালিনী, ফুলের সাজি লইয়া ?

মালিনী। ফুল ফুটেছে নানা রকম, ডাল পড়েছে নুইয়া।

মালি। আগের ফুল তুলিস্ না লো কলি-কলি !
গোড়ের ফুল তুলিস না লো বালি-বালি !

মেয়েরা। মধ্যের ফুল তুলিয়া আনিস নাগেশ্বরের মালি।
(মালির প্রস্থান ও ফুল নিয়ে প্রবেশ)

মেয়েরা। নাগেশ্বরের মালি রে !
কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি ?
কোন্ কোন্ ডালে খাইলি লইলি ?
কোন্ কোন্ ডালে নিশি পোহাইলি ?

মালি। টজতের ডালে রাঁধলাম বাড়লাম,
অতসীর ডালে খাইলাম লইলাম,
গাঁদার ডালে নিশি পোহাইলাম।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(এরপর বেত হাতে নিয়ে কুয়াশা ভাঙার পালা।)

মেয়েরা। কুয়া ভাঙুম কুয়া ভাঙুম বেৎলার আগে।
সকল কুয়া গেল অই বরই গাছটির আগে ॥
ওরে ওরে বরই গাছ ! ঝুলন দে।
ছয়-কুড়ি ছয়টা বরই লিখিয়া দে ॥
লিখিতে পড়িতে একটা হইল উনা।
কাইটা কুইটা ফেলামুনে শিবের কানের সোনা ॥
শিবের কানের সোনা না লো, বেড়ার মাটি।
আপ্পান ভাই বইন্ লোহার কাটী ॥
লোহা না লো বিয়া করে।
পাড়া ভইরা লো জোকার পড়ে ॥
জয় দিব না লো আমরা জোকার দিব।
সোনা দুইটি ভাই-বইন্ কোলে তুইলা নিব ॥

—এইভাবে ব্রত কখন যে যাত্রা হয়ে দাঁড়ায় টের পাওয়া যায় না। কুয়াশা ভাঙার পর তৃতীয় দৃশ্যে অনেক কষ্ট করে পথঘাট দেখিয়ে সূর্যকে ওঠানো হল।

দ্বিতীয় অঙ্কে সূর্যের সঙ্গে মাধবের কন্যা চন্দ্রকলার বিয়ে দেওয়া হল। প্রথম দৃশ্যে বাসরঘরে চন্দ্রকলা আর সূর্যের মধ্যে কথা হচ্ছে। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে চন্দ্রকলার নানান প্রশ্নের উত্তর দেন সূর্য ঠাকুর। কাউয়ায় করে কলমল কলমল, কোকিল করে ধ্বনি—চন্দ্রকলা দেখে শুনে নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'তোমার দেশে যাবো সূর্য, মা বলিব কারে?' সূর্য বলেন, 'আমার মা তোমার শ্বাশুড়ী মা বলিও তারে।' সূর্যের শুধু মা-বাপ ভাই-বোন আছে তাই নয়, আগের পক্ষের স্ত্রী গৌরীও আছেন। সূর্যের ভাঁড়ারের কর্তা হলেন সিকদার। ঠিক যেন বুড়ো নায়েব মশাই। তিনিও আছেন সপরিবারে। সূর্যের সংসারটা যেন অবিকল এক জমিদারবাড়ি। সূর্যের এই বিয়েতে গৌরীর সুখ নেই। তিনি বাপের বাড়ি যেতে চান। সূর্যের কানে যখন কথাটা পৌছুল তখন বাঁশের চটা দিয়ে তিনি গৌরীকে মারবার ভয় দেখালেন। তারপর তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় সূর্যের দুই ছেলে—বড় ছেলের নাম রাল, রাউল বা লাউল; ছোট ছেলের নাম শিব, শিবে বা শিবাই। চতুর্থ অঙ্কে লাউলের বিয়ে হল এবং সূর্যঠাকুর ঠাকুরদা হলেন।

॥ শিবঠাকুর ॥

এ থেকে বোঝা যায়, সূর্য ঠাকুরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার জন্যে সংসারের মায়ায় রীতিমতো জড়ানো হয়েছে। এই ব্রতটির মধ্যে সূর্যদেব শুধু যে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছেন তাই নয়—বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজের অনেক খবর এর মধ্যে ইশারায় লুকানো আছে।

এই ব্রত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সূর্য বা রায় ক্রমে ক্রমে বদলে হয়েছে লাউল বা শিবঠাকুর। মানুষ যাতে গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু আর দরবার-আলো-করা ছেলে পায়—তারই জন্যে জীবন এবং বসন্তের দেবতা সূর্যকে বিয়ে দিয়ে নাতি-পুতি নিয়ে থিতিয়ে বিতিয়ে বসবার ব্যবস্থা।

শিব আসলে আদিম সমাজেরই মানুষ ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন দলের সর্দার বা মোড়ল। ব্রতের সময় প্রধান যাদুকর, ব্রত যখন নাচ আর নাট্য হয়ে উঠল, তখন সেই নাচ আর নাট্যেরও গুরু ছিলেন শিব। তারপর নটরাজ চাষবাসের যুগে হলেন ঋতুরাজ। সূর্যঠাকুরের ভূমিকা অভিনয় করে দলের সর্দার আস্তে আস্তে হয়ে দাঁড়ালেন নিজেই শিবঠাকুর।. এই শিবঠাকুর গোড়ায় কিন্তু নিজেও বেজায় খাটিয়ে লোক ছিলেন। ধান ভানবার সময় মেয়েরা তাই শিবের গীত গাইত। প্রাচীন শিবের ছড়ায় তাই যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে নেশাখোর নিষ্কর্মা ভোলানাথের কোনো মিল নেই।

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশান বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিকে চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাঁটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
কিতা মুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট্‌পট্‌।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সটসট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া॥

ছড়া থেকে মনে হচ্ছে শিব নিজে যতটা না খাটতেন, ভীম নামে কৃষাণটিকে তার চেয়ে ঢের বেশি খাটাতেন। শুধু চাষবাস নয়, ক্ষেতের মশা আর জোঁক তাড়াবার কায়দাকানুন, গ্রহতত্ত্ব এবং বশীকরণের জাদুমন্ত্রও তিনি জানতেন।

॥ শিব পর কৃষ্ণ ॥

মাঘমণ্ডল ব্রতে আছে সূর্যঠাকুরের বিয়ে। নীলপুজোয় আছে শিব ঠাকুরের বিয়ে। ব্রতটাই পরে বোধহয় পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সূর্যের বদলে মাথা তুলেছেন শিবঠাকুর। এক জায়গায় জড় হওয়া নয়, বাড়ি বাড়ি ঘোরা। ক্রিয়াকর্মের চেয়ে সেজেগুজে গান গাওয়ার দিকেই বেশী ঝোঁক।

নীল বলতে নীলকণ্ঠ মহাদেব। কথায় বলে 'পাট-গোঁসাই'। এক খণ্ড নিম কিংবা বেলগাছের মাথার দিকটা ছুঁচোল করে কেটে তাতে লাগান হয় চক্র আর ত্রিশূল। তারপর মাথায় তেলসিঁদুর মাখিয়ে লাল শালুতে পাট-গোঁসাইয়ের সারা অঙ্গ মুড়ে দেওয়া হয়। তারপর সব বাড়িতে বাড়িতে নীল নিয়ে সঙ সেজে ঘোরা আর শিবের বিয়ের গান গাওয়া। যারা এইভাবে সঙ সাজে তাদের বলে নীলসন্ন্যাসী। তাদের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় পাগড়ি, পরনে লাল কাপড়, হাতে বেতগাছি। দলের সর্দারকে বলে বালা।

প্রথমে হয় নীলের গান। শিবের বিয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা। ঠিক তাদের সমাজে যেমনটা হয়। কিন্তু তারপরই হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের স্তোত্র। তার ভাষাও যেমন সংস্কৃত-ঘেঁষা, ভাবের দিক থেকেও তা অলৌকিক দেবতা-ঘেঁষা। বেশ বোঝা যায়, পরের দিকে দেবতার আসন থেকে শিবকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা চলেছে। এর পেছনে বামুন-পণ্ডিতদের হাত আছে।

শিবের পর এলেন কৃষ্ণ। এবার শুধু গান নয়, সেই সঙ্গে কথাও এসে জুটল। গান আর কথা মিলে তৈরি হল পালাগান আর যাত্রাগান।

কৃষ্ণের নাম রাই কানু। আরেক নাম বিষ্ণু। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু মানে সূর্য। কাজেই যিনি ছিলেন রায়, তিনিই হয়েছেন রাই কানু। গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের যে সংসারযাত্রা, তাই থেকেই এসেছে 'সৌরযাত্রা' এবং তার পরে 'কৃষ্ণযাত্রা'। সূর্যদেবের 'রাস' যাঁদের নিয়ে, তাঁরা হলেন রাধা, অনুরাধা, চিত্রা ও বিশাখা। কৃষ্ণেরও সহচরী তাঁরাই।

ছটি পালা গান জুড়ে কৃষ্ণযাত্রা। তার মধ্যে শেষের দিকে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা জুড়ে নিয়ে নিমাইকেও অবতার করে তোলা হয়েছে।

॥ পালাগান আর মহাকাব্য ॥

জাদু-বিশ্বাস থেকে একদিকে ধর্ম-বিশ্বাস, আবার অন্যদিকে ব্রতনাট্য থেকে পালাগান আর যাত্রা এসে গেল।

গোড়াতেই বলা হয়েছে : প্রকৃতির মধ্যে একদিন আদিম মানুষ অবাক হয়ে দেখেছে পালাক্রমে মৃত্যু আর জন্ম, যাওয়া আর আসা। ধরা পড়েছে প্রহর-পল, দিন-তিথি, মাস-বছর আর ঋতুচক্র। ক্রমে চাঁদের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ঋতুর রাজা সূর্য।

মানুষ যখন চাষীবাসী হল তখনই দেখা দিল বারোমাসে তেরো পার্বণ। সমস্ত পালপার্বণের পেছনে থাকল জন্ম আর মৃত্যুর পালা। বাংলাদেশে পালাগান গাইবারও আবার কতকগুলো নিয়ম আছে। যেমন : রামায়ণ পালাগান। এর মধ্যে আছে পাঁচটি পালা—সীতার বিবাহ, শক্তিশেল, রাবণবধ, পিতাপুত্র আর লক্ষ্মণবর্জন। যে বাড়িতে ছেলেপুলের জন্ম হবে, সে বাড়িতে গাওয়া হবে 'সীতার বিবাহ' কিংবা 'পিতা-পুত্র' পালা ; যে বাড়িতে কোনো বয়স্ক লোকের মৃত্যু হয়েছে, সে বাড়িতে গাওয়া হবে 'রাবণবধ' পালা ; যে বাড়িতে কোন নাবালকের মৃত্যু হয়েছে, সেই বাড়িতে গাওয়া হবে 'লক্ষ্মণবর্জন' বা 'শক্তিশেল' পালা।

পালাগানের এই যুগে সমাজে বড় রকমের একটা বদল দেখা গেল। মানুষ চাষবাসের জোরে তখন বাড়তি খাবার ফলাতে পারছে। সমাজে দেখা দিয়েছে শূদ্র আর ব্রাহ্মণ, দাস আর প্রভু। হাতের কাজ আর মাথার কাজ আলাদা হয়ে গেছে। শিব প্রথমে দেখা দিলেন চাষীর বেশে, তারপর নিষ্কর্মা নেশাখোর হয়ে উঠলেন। সমাজের মাথাওয়ালাদের হাতে জাদুবিদ্যা থেকে একদিকে এল কৃষিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ এবং নানা শস্ত্রশাস্ত্র—অন্যদিকে এল গীতিকাব্য, পালাগান, যাত্রা। প্রকৃতির সঙ্গে বাইরের লড়াইটা হল বিজ্ঞান আর ভেতরকার লড়াইটা হল শিল্প।

আমাদের দেশে রামায়ণ আর মহাভারত এই সময় মুখে মুখে রচনা হয়েছিল। রামায়ণ আর মহাভারত কারো একার রচনা নয়। কয়েক শো বছর ধরে অসংখ্য মানুষের তৈরি পালাগুলো জুড়ে জুড়ে এবং ভেঙেচুরে এই মহাকাব্য দুটি গড়ে উঠেছে। বোধহয় তার অনেক পরে জাত-গায়ক কুশীলবদের মুখ থেকে শুনে বাল্মীকিরা লেখেন রামায়ণ আর ব্যাসেরা লেখেন মহাভারত। বাল্মীকি বা ব্যাস কারো একার নাম নয়। দুটি সম্প্রদায়ের নাম।

এই ধরনের পালাগানে একজন থাকত মূল গায়েন, বাকিরা দোহার হিসেবে ধুয়ো ধরত। গ্রীক গাথা হোমার-এর ইলিয়াড আর ওডিসির বেলায় তাই দেখা যায়। পরে বীণা হাতে মূল গায়েনই শুধু থাকল, বাকিরা আস্তে আস্তে আসর থেকে বিদায় নিল। তারপর গায়কের হাতের বীণা খসে গিয়ে গায়ক হয়ে উঠল কবি। গান হল কাব্য।

রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি—সমস্তই হল রাজারাজড়াদের যুদ্ধজয়ের বীরত্বগাথা। ভরত রাজবংশ এবং গ্রীক রাজাদের রাজসভায় থাকত একদল কবিগায়ক—ভারতীয় কুশীলব এবং হোমেরিদাই। এরা ছিল জাত-কবি। রাজাদের কীর্তিকাহিনী এরা বংশপরম্পরায় সুর করে গাইত। আজকের কবিয়াল কিংবা তর্জাগায়কদের মতোই আসরে দাঁড়িয়ে তারা মুখে মুখে গান তৈরি করত। রচনার অনেক পরে মহাকাব্যগুলো লেখা হয়। কাজেই লেখার সময় মূল রচনা যে অবিকল এক থেকে গেছে, তা বলা যায় না। এই মহাকাব্যগুলোই আবার ভেঙেচুরে নানা লোক নানাভাবে লিখেছে। তা থেকে নানা রকম পালা লেখা হয়েছে।

॥ নাচ বদলে ব্রত ॥

মহাকাব্যের ঢের আগেই যাত্রা আর নাটকের সূচনা হয়েছিল। ব্রত থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ব্রতপার্বণেরও আগে নাচ। নাচ আর কাজ গোড়ায় ছিল পিঠোপিঠি। কাজের আগে দল বেঁধে একবার কাজের মহড়া দিয়ে নেওয়া হত। সেই মহড়াটাই ছিল নাচ। কাজের ধরন যত ভাল হতে লাগল, ততই কাজের আগে নেচে নেবার দরকারও আর থাকল না।

খাটাখাটুনির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে নাচ এবার নানারকমের সামাজিক দরকারে লাগল। সমাজে তখন শুরু হয়েছে কাজ ভাগাভাগির পালা। একেক দল একেক কাজে হাত পাকাচ্ছে। জাদু জিনিসটা তখন রীতিমত আলাদা বিদ্যে হয়ে উঠেছে। নাচ আর মহড়া না থেকে হয়ে উঠেছে ব্রতপার্বণ। তার জন্যে দরকার পড়েছে জাদুকর বা পুরুতের।

মহাকাব্যের মূলে ছিল যুদ্ধবিগ্রহ। যাত্রা-নাটকের মূলে ছিল চাষবাসের বিস্তার। ফলমূল জোগাড়, মাছমাংস শিকার কিংবা পশুপালনের চেয়ে চাষের কাজটা ছিল শক্ত। আদিম সমাজে পুরুষরা লড়াইয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকত বলে প্রথম প্রথম মেয়েদেরই ওপর চাষের ভার পড়েছিল। কাজেই নতুন যেসব ব্রতপার্বণ দেখা দিল, তাতে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী আর ষষ্ঠী ঠাকরুনেরাই হয়ে উঠলেন প্রবল।

এই সময় সূর্য রাজা বা রায় হলেও চাঁদই ছিল প্রধান। চাঁদ ছিল রানী। বীজ মরে গিয়ে যেমন ধান হয়, তেমনি সমাজে সুখশান্তির জন্যে রাজাকেও প্রাণ দিতে হত। রোজ সন্ধ্যেয় মরে গিয়ে সূর্য যেমন রোজ সকালে বেঁচে ওঠে, তেমনি রাজা প্রাণ দিলেও আবার প্রাণ ফিরে পায়। রাজা অমর—এই বিশ্বাসেই রাজাকে বলি দেওয়া হত। পরে সত্যিকার রাজাকে বলি না দিয়ে তার বদলে পশু-বলির ব্যবস্থা হল। সেই সমাজটাকে বলা হত ক্ষেত্রপ্রধান সমাজ। পুরুষরা ছিল বীজ; মেয়েরা ছিল ক্ষেত্র। রাজা ছিল রানীর হুকুমের চাকর।

॥ ক্ষেত্রব্রত আর মেঘারানী ॥

আজও আমাদের দেশে তার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় 'ক্ষেত্রব্রতে'র মধ্যে। ক্ষেত্র-ব্রতই হয়েছে লক্ষ্মীব্রত। লক্ষ্মীব্রতের কথা থেকে জানা যায় রাজা নেহাত গরিব, খাবার পাতে ঘি পায় না এবং রানীর কথামতো প্রাণ দেয়। এর মধ্যে সেই পুরনো সমাজের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আজও বৃষ্টির জন্যে গ্রামদেশে' মেঘা-রানীর কুলো' নামাতে হয় আর গাইতে হয়:

হাদে লো বুন মেঘারানী
হাত-পাও ধুইয়া ফেলাও পানি।
ছোট ভুঁইতে চিন্‌চিনানি
বড় ভুঁইতে হাঁটু পানি।
মেঘারানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি লামে লো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কালা মেঘা ধলা মেঘা বাড়ি আছো নি ?
গোলায় আছে বীজধান বুনাইতে পারো নি ?

রানীদের যে সেকালে কতখানি দাপট ছিল, 'ময়নামতীর গান' পড়লেই তা বোঝা যায়। রানী ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা; হাড়িসিদ্ধা ছিলেন তাঁর গুরুভাই। ময়নামতী নানা রকমের ভোজবাজি জানতেন।

'ময়নামতীর গানে'র মধ্যেই আবার দেখা যায় রানী আর রাজাকে দাবিয়ে

রাখতে পারছে না। রাজার সঙ্গে তান্ত্রিক পুরুতদের রেষারেষি দেখা দিয়েছে। চাষবাস যত বাড়ছে, ঘরের আঙিনা ছাড়িয়ে যতই তা মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে —ততই সমাজে ক্ষেত্রের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে বীজ, মেয়ের চেয়ে পুরুষ, রানীর চেয়ে রাজা, চাঁদের চেয়ে সূর্য।

রা'লদুর্গার ব্রতে দেখা যায় হরপার্বতীর পাশাখেলায় হারজিত নিয়ে শিব-দুর্গার মধ্যে রেষারেষি।

এমনিভাবে সমাজ ক্রমান্বয়ে বদলেছে। যেসব রথীমহারথী যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে মেতে থাকত তারা হয়ে দাঁড়াল এককজন বড় বড় রাজা-মহারাজা। বিরাট এলাকা জুড়ে দেখা দিল তাদের রাজ্য আর রাজবংশ। তারা হল প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। তার পরে যখন দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের চলন হল, তখন ক্ষত্রিয় রাজাদের পাল্টা শক্তি হিসেবে মাথা তুলতে লাগল বৈশ্য, বণিক আর শ্রেষ্ঠীর দল। তখন চাষবাস ছেড়ে লক্ষ্মী এসে ভর করলেন বাণিজ্যে। জমির চেয়ে বড় সম্পদ হয়ে দেখা দিতে লাগল কড়ি। রাষ্ট্রশক্তি তখনও রাজামহারাজাদের হাতে; কিন্তু সওদাগরদের দাপট বেড়ে চলল। আস্তে আস্তে তারা যখন রাষ্ট্রশক্তির দিকে হাত বাড়াল তখন শুরু হল ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের, রাজা আর শ্রেষ্ঠীদের লড়াই। এই সময় গড়ে উঠল বড় বড় নগর আর বন্দর। দেশে দেশে ছুটল সওদাগরদের সপ্তডিঙা। রাজা আর সওদাগরের এই নাটকীয় সংগ্রামের ভেতর দিয়েই দেখা দিল যাত্রা আর নাটক। আমাদের দেশে সেই যুগটাকেই বলে বৌদ্ধযুগ। ব্রাহ্মণদের হটিয়ে দিয়ে বৈশ্যেরা তখন এগিয়ে আসছে। সওদাগরদের কাছে রাজারা হটে যাচ্ছে।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে এ দেশের সমাজ যে ছোটোয় বড়োয় ভাগ হয়ে থাকে, তার বিস্তর প্রমাণ আছে। এই রকমের একটি প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের গল্প। একদিকে ইন্দ্রের অগাধ ঐশ্বর্য, অন্যদিকে শুনঃশেপের বাবা অজীগর্ত বেচারীর দিনান্তে দুমুঠো ভাতের জোগাড় নেই। লোভে পড়ে তাকে ছেলে বিক্রি করতে হল। রাজসূয় যজ্ঞে সেই ছেলেকে বলি দেওয়া হবে। ছেলেকে হাড়কাঠে দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল্লাদেরা বেঁকে বসল। শুনঃশেপ ধিক্কার দিয়ে বলেছিল: সেই পুরনো ঋত আমরা হারিয়েছি। আর সেই সঙ্গে মুখের ওপর ঘৃণাভরে জানিয়ে দিয়েছিল—'তোমরা মানুষ নও।'

॥ শৈলূষ ॥

'তোমরা মানুষ নও'—যারা মারছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মার খাচ্ছে তাদের এ যেন প্রথম গর্জে-ওঠা প্রতিবাদ। জল্লাদরা শুনঃশেপের মতই ক্রীতদাস ছাড়া কিছু

নয়। তাই নিজেদেরই একজন সগোত্রকে মারতে তাদের হাত ওঠেনি। শুধু তাই নয় ; শুনঃশেপ তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে সেই হারানো দিনগুলোর কথা —যখন সমাজে সবাই সমান ছিল। যখন গোলাম আর মনিবে, গরিবে আর বড়লোকে সমাজ ভাগ হয়ে যায়নি।

কিন্তু এর সঙ্গে যাত্রা কিংবা নাটকের সম্পর্কটা কোথায় দেখা যাক।

বৈদিক যুগের কাছাকাছি সময়ে একটি শব্দ পাওয়া যায়— 'শৈলূষ'। এর দুটি অর্থ আছে। যারা বলির ব্যাপারে জল্লাদ-বৃত্তি করত এবং যারা নাটক করত তাদেরই বলা হত 'শৈলূষ'। কোথাও কোথাও কোল-ভীলদেরও এই নাম দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত, বলির জায়গায় সে সময় গান হত। যাকে বলি দেওয়া হচ্ছে পশু হলেও তার প্রতি জল্লাদের একটা মমতা থাকত। কেননা একই মনিবের তারা অধীন। তাই বলির পর সেইসব পশুদের গুণগান করার রেওয়াজ কোন কোন দেশে দেখা যায়। এমনভাবে স্তুতি করা হয় যেন বলির পশুরা পশু নয়— অলৌকিক শক্তিধর মানুষ। পশুর নাম করে সেকালের শৃঙ্খলিত মানুষ নিজেদেরই সঙ্ঘশক্তির স্তুতি করত।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। তখনই এদেশে বৌদ্ধ সঙ্ঘসঙ্ঘারামের ভেতর দিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। বছরের একেকটি নির্দিষ্ট দিনে যে যেখানে আছে এক জায়গায় জড়ো হয়ে দৃশ্যপট টাঙিয়ে নাচ গান উৎসব হত। এক কথায় বলা যায়, যাত্রা হত।

॥ পালা বদ্‌লে ॥

যাত্রাগান আর নাটকের লোকায়ত রূপ পরে আর থাকেনি। এর পর আবার যখন সমাজে নতুন করে দিনবদলের পালা এল, তখনই নতুন চেহারার নাটক দেখা দিল। এতদিন জমিই ছিল সমাজের একমাত্র সম্পদ। এবার শিল্প-বাণিজ্যের ওপর ভর করে নতুন একদল মানুষ মাথা তুলল। গড়ে উঠল নগর, বন্দর। দেখা দিল নগরসঙ্কীর্তন—গান করে যাত্রা, শোভাযাত্রা। গ্রীকদের দেশে যার নাম 'কমেডি'। গ্রীসে গণতন্ত্র থেকেই এসেছিল নাটকের প্রেরণা।

ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যের জোয়ারের মুখে নতুন করে দেখা দিল নাটক। তার কেন্দ্র হল নগর। তাতে স্থান পেল একদিকে রাজ্যলোভ, কুটিল ষড়যন্ত্র, ভাঁড়ামি, বিলাস-ব্যসন, ভদ্র পোশাক-পরা দুর্নীতি আর সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ; অন্যদিকে ভুলে-যাওয়া চরিত্র আর ঘটনা, হারানোর পর বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফিরে পাওয়ার গল্প। শেষের অংশে পড়ে অশ্বঘোষ আর

কালিদাসের নাটক। এর ভেতর সাধারণ মানুষের আশা আর উদ্বেগ ধরা পড়েছে। গুপ্ত রাজাদের আমলে যখন দেশের লক্ষ্মী সত্যিই বাণিজ্যে বাস করছিলেন, তখন সমস্ত দিক দিয়ে শিল্প-সাহিত্য এগিয়ে গেল। কিন্তু এই এগোনোর মধ্যেই পিছিয়ে পড়ার দিক ছিল। তা হল, সাধারণ মানুষকে অনেকখানি পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁক। তারই ফলে বোধ হয় পরে শিল্পসাহিত্যে এক অন্ধকার যুগ দেখা দেয়।

কিন্তু যাত্রাগান গ্রামের মানুষদের মধ্যে টিঁকে থাকল। গ্রাম বলতে তখন আর ষোলো আনা এক বোঝায় না। যারা হাতের কাজ করে তারা নীচু। যারা মাথার কাজ করে তারা উঁচু।

নীচুতলার মানুষেরা নাচ-গান-নাটকের ধারা নিজেদের শিবের জটার মধ্যে যেন বেঁধে রাখল। তাই আজ সেই পুরনো দিনের হারান শিল্প খুঁজে পেতে হলে যেতে হবে হাড়ি-ডোম-বাগ্দীর ঘরে। তাদের ঘরে বাঁধা শুধু আমাদের অতীত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎও।

যম-নিয়তি-যক্ষ

যাত্রা শুনতে গিয়ে খুব মজা লাগে যখন কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ বিবেক কিংবা নিয়তির গান শুরু হয়ে যায়। খাঁড়া নাচাতে নাচাতে ছুটে এসে হুম্ করে সে গেয়ে ওঠে : মাথার ওপর ঝুল্ছে খাঁড়া……

বিবেক বেচারী আজ আমাদের কাছে বেশ খানিকটা হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রায় আজ সে একদম ফালতু। তাই বলে বরাবর তার অবস্থা এমন ছিল না।

এক সময়ে বিবেকই ছিল যাত্রার মূল গায়েন—বলা যায়, নাটের গুরু। ছাড়া ছাড়া বিষয়গুলোর মধ্যে বাঁধুনি আনা, সমস্ত ঘটনাকে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে খানিকটা ব্যাখ্যাকার হিসেবে হাজির হওয়া—এই ছিল বোধ হয় বিবেকের কাজ।

॥ বিবেকের গান ॥

'বিবেক' মানে : পরস্পরের বাদানুবাদের ভেতর দিয়ে বস্তুর স্বরূপ বিচার। গ্রীক ভাষায় যাকে বলে 'ডায়ালেগো'। বিবেকই যে ক্রমে আলাদা হয়ে কবির লড়াই, তরজা এবং হাফ-আখড়াই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

পালপার্বণ থেকেই এসব উঠেছে। পালপার্বণের মূল কথা হল ঋতুবন্দনা—বারোমেসে গানের মধ্যে যার পরিচয়। আদিম যুগ থেকে এবং 'বিশেষ করে চাষবাসের যুগে, মানুষ দেখেছে মৃত্যু আর জীবন। যাওয়া আর আসা, অন্ধকার আর আলোর দ্বন্দ্ব। মৃত্যু আর জীবনের এই পালা থেকেই গড়ে উঠেছে জাদুমন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পুজো, নাচ-গান-নাটক। গোড়ায় দেবতা ছিল না—শুধু ছিল ঋতু আর ঋতু। প্রকৃতিকে দলবদ্ধভাবে নকল করলেই প্রকৃতি মুঠোয় এসে যাবে—এই ধারণা থেকেই আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম।

সমাজে যখন দলের ওপর দলপতির প্রাধান্য দেখা দিল তখনই এল ঋতুচক্রের দেবতা—সূর্য, শিব, কৃষ্ণ। দেবতা গোড়ায় অমর ছিল না—তাকে মানুষের মত, জীবপ্রকৃতির মতই মরতে হত। মৃত্যুর পর হত নতুন জন্ম। যেমন মাটির নিচে বীজ মরে ধান হয়। তখন জন্ম আর মৃত্যুর ছিল একই দেবতা। যমের তখনও জন্ম হয়নি।

পালপার্বণে আর ঋতু-উৎসবে দেবতার ভূমিকা নিল জাদুকর-পুরুত-ঋত্বিক। ক্রমে সমবেত ব্রত-উৎসব থেকে গাথা আর গান যখন আলাদা হয়ে

যেতে লাগল, তখন পালপার্বণের নেতা ক্রমে হল পালাগানের প্রণেতা—মূল গায়েন। পালাগানের প্রণেতাই পরে হল যাত্রা বা পালার নট বা অভিনেতা। একই দেবতার মধ্যে যেমন জীবন আর মৃত্যুর দ্বন্দ্ব, একই দেবতার যেমন দুই চরিত্র—তেমনি গোড়ার দিকে একই নট দুটো চরিত্রের অভিনয় করত। কথকতার মধ্যে, বহুরূপীর সাজপোশাকের মধ্যে আজও তার রেশ দেখতে পাওয়া যায়।

পরে সমাজে যতই কাজ ভাগাভাগি হতে লাগল, ততই আলাদা আলাদা দেবতা দেখা দিল। যম বেচারীর কাঁধে চাপল মৃত্যুর দপ্তর। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যেকার যোগসূত্রটা ছিঁড়ে যেতে লাগল।

সংস্কৃত নাটকে যে ছিল সূত্রধার, তার কাজ ছিল পাত্রপাত্রীদের চিনিয়ে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে তাদের পরিণামও আগে থেকে ছকে দেওয়া। যাত্রায় বিবেকের ভূমিকায় এই সূত্রধারকেই যেন খুঁজে পাওয়া যায়। আগে থেকে সমস্ত কিছু বলে দেবার মত ক্ষমতা আজ আর তার নেই। দেখে মনে হয়, নাটকের ঘটনাগুলোর ওপর তার যেন পুরো দখল নেই—ঘটনার মাঝে পড়ে সে ঘটনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করছে। তার এই অসহায়তাই পরে তাকে বিদূষক এবং ভাঁড় করে তুলেছে।

।। নিয়তি ।।

বিবেকের রকমফের হিসেবে যাত্রার আসরে দেখা দেয় যম, যমদূত, নিয়তি। এদের প্রত্যেকেরই পেছনে রয়েছে ঋতুচক্র আর জন্মমৃত্যুর অমোঘ নিয়ম। নিয়ম থেকেই এসেছে যম আর নিয়তি। কার্য-কারণের সূত্রটাই হল নিয়ম। আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যে কার্য-কারণের হাতুড়ে নিয়ম আবিষ্কার করেছিল, তারই নাম জাদু। এই জাদুই পরে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্ম।

প্রকৃতির মধ্যে যেমন নিয়ম, তেমনি মানুষের মধ্যে সমাজ। প্রকৃতির নিয়ম যেমন ঋতু, মানুষের নিয়ম তেমন ঋত। ঋত বলতে বোঝাত মানুষের গোটা দল, আস্ত অবিভক্ত সমাজ। জাদুর যুগে মানুষ ভাবত, প্রকৃতির ওপর তার অবাধ অধিকার। তেমনি সমাজেও ছিল সকলের সমান এবং অবাধ অধিকার।

কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের ছেলেমানুষী জাদুবিশ্বাস বাস্তব জীবনে ঘা খেতে লাগল। প্রতি পদে ঠেকে ঠেকে মানুষ আঁচ করতে পারল—প্রকৃতি নিজের খেয়ালে চলে। প্রকৃতি মানুষের কথার বাধ্য নয়। তখনই এল প্রকৃতিকে তোয়াজ করার ব্যাপার। প্রকৃতিকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া নয়, প্রকৃতির কাছে মানত করা। সেইসঙ্গে এল পুজো-আর্চা, দেবদেবী, পাণ্ডা-পুরুত।

প্রকৃতির নিয়মকানুন জেনে প্রকৃতিকে বদলানোর ব্যাপারে সে যুগে যারা সিদ্ধহস্ত ছিল, তারাই হল সে যুগে পুরুত-ব্রাহ্মণ-সিদ্ধাচার্য। তাদেরই হাতে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রথম হাতেখড়ি। প্রকৃতির ওপর এই অধিকারভেদ থেকে সমাজে এল অধিকারভেদ। বর্ণাশ্রম আর জাতবিভাগ। এরই ফলে সমাজে দেখা দিল ব্যক্তিগত মালিকানা, অধিকারী আর অনধিকারী, মনিব আর ক্রীতদাস, ধনী আর নির্ধন। দেখা দিল মন্ত্রগুপ্তি আর ধর্ম।

একদিক থেকে প্রকৃতিকে জেনে মুঠোয় আনা হল; কিন্তু পুরুত-ব্রাহ্মণদের হাতে পড়ে সেই জানার ব্যাপারটা অজ্ঞেয় রহস্য হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতির নিয়ম হয়ে দাঁড়াল অদৃষ্ট, নিয়তি, বিধির বিধান। তার ওপর মানুষের যেন কোন হাত নেই। হাতেকলমে মানুষ আগের মতোই প্রকৃতির ওপর নিজের ইচ্ছে খাটিয়ে ফসল ফলাতে লাগল, কাপড় বুনতে লাগল—কিন্তু মনের ওপর চেপে বসল অন্ধ বিশ্বাস।

কাজ আর কথা, হাত আর মাথা, বস্তু আর মন আলাদা হয়ে গেল। যারা মাথার কাজ করে, তারা হল ওপরতলার লোক—দেবকুল। যারা হাতের কাজ করে, তারা হল নিচের তলার লোক—দৈত্যকুল। সমাজে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কর্মফল এল।

ছোটোয় আর বড়োয়, রাজায় আর প্রজায় সমাজ ভাগ হয়ে গেল। তার মানে এ নয় যে, দু দল একদম আলাদা হয়ে গেল। তা যদি হয়, রাজার দল তো তাহলে না খেয়ে মরবে। কাজেই মিলেমিশে থাকা দরকার, সমাজটাকে এক রাখা দরকার। রাজার দলই হল ভগবানের অবতার, মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। গোড়ায় রাজারা প্রজার উপকারে লাগত। রাজারা ছিল প্রজাদের মাইনে-করা ক্ষেত-ওয়ালা। দারোয়ানি করে তারা ছ ভাগের এক ভাগ ফসল পেত। পরে রক্ষকই হয়ে দাঁড়াল ভক্ষক। লোভ যত বাড়তে লাগল ততই তারা হয়ে উঠল নিষ্ঠুর অত্যাচারী।

নিয়তি বিকট যমের মূর্তি নিল। দেবতারা হল নিষ্ঠুর। তাদের চাহিদার শেষ নেই। পান থেকে চুন খসলে তাদের হাতে অশেষ ভোগান্তি।

কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে উল্টোফলও ফলল। নিচের তলার মানুষ সেই অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করেনি। কখনও তারা মালিকের দলকে ঘা দিয়েছে সোজাসুজি, কখনও ঘা দিয়েছে আড়াল থেকে। রাজদণ্ড নিয়ে নানাভাবে দু দলে কাড়াকাড়ি হয়েছে।

সমাজের মাথায় যারা, তারাই নিয়তি। সমস্ত সামাজিক ঘটনার লাগাম তাদেরই হাতে। তাই নাটকের একেবারে গোড়ায় থেকে সেই নিয়তিই নাটকের

গতি আগে থেকে বেঁধে দিত। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের পাল্টানে পড়ে সমাজকর্তাদের পক্ষে বরাবর সূত্রধার হয়ে থাকা সম্ভব হল না। নিয়তিকে হটে যেতে হল। তার আইন অমান্য করে বসেছে জীবন-রঙ্গমঞ্চের পাত্রপাত্রীরা। তাই নিয়তিকেও নট সেজে ঘটনার মাঝে পড়ে ঘটনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করতে হল। ঘটনার ওপর দখল যতই সে হারিয়ে ফেলে ততই সে মরীয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। খাঁড়া হাতে করে বারবার দেখা দিয়ে যতই সে হাত-পা ছোঁড়ে, ততই সাধারণ মানুষ তাকে ভাঁড় মনে করে হেসে ওঠে।

নিয়তি হয়ে দাঁড়ায় উপহাসের পাত্র। তখনই নিয়তির হাতবদলের প্রশ্ন ওঠে।

।। যক্ষের পালা ।।

এবার নিয়তির বেশে দেখা দেয় যক্ষ। তার কুতকুতে চোখ। কদাকার মুখ। সব সময় কী-খাই কী-খাই। আসল রূপটাকে ঢেকে রাখে সে সোনা-রুপো-তামার চাদরে।

সেই যক্ষের ধন টাকাকড়ি। গোড়ায় সে মানুষের ভারি কাজে লেগেছিল। বেচা আর কেনার ব্যাপারে মাঝ-পড়া হয়ে মানুষের কাঁধের বোঝা সে বেজায় হাল্কা করে দিয়েছিল। চাষী হাঁসমুরগী নিয়ে হাটে যেত। খদ্দের হাঁসমুরগী নিয়ে তাকে টাকা দিত। সেই টাকায় সে গামছা-কাপড় যা দরকার কিনত।

কিন্তু কিছুদিন এইভাবে চলার পর এক নতুন ব্যাপার দেখা দিল। তখন আর কেনার জন্যে বেচা নয়, বেচার জন্যে কেনা। সওদাগর সস্তায় জিনিস সওদা করে আর চড়া দরে বেচে। ফলে তার হাতে লাভ থেকে যায়। সেই টাকা আবার সে একইভাবে খাটায়। সওদাগরের নজর জিনিসের দিকে নয়, টাকার দিকে। এমনি করে শুরু হয় টাকার পেছনে ছোটা। টাকা আর মধ্যস্থ রইল না। টাকাই হল সর্দার, টাকাই সর্বেসর্বা। 'টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে। হাতি দিয়ে হাতি বাঁধে ॥'

টাকা খাটাতে খাটাতে একদিন সওদাগর দেখে সর্বনাশের দোরগোড়ায় সে পৌঁছে গেছে। তখন সে বোঝে টাকার পেছনে নয়, এতদিন সে সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছে। সোনার হরিণ নয়, আসলে সে রাক্ষস মারীচ।

গ্রীক পুরাণে মিদাসের গল্প আছে। যে রাজ্যে সোনার খনির ছড়াছড়ি, মিদাস ছিল সেই রাজ্যের রাজা। একবার সে বর চেয়েছিল—যা কিছু সে ছোঁবে তাই যেন সোনা হয়ে যায়। সে যা চেয়েছিল তাই হল। যাতেই সে হাত দেয় তাই সোনা হয়ে যায়। খেতে বসে সে মাথায় হাত দেয়। যা কিছুই মুখে

তোলে তাই দেখে সোনার ডেলা। বেচারী শেষ পর্যন্ত তাল তাল সোনার মধ্যে হা-অন্ন হা-অন্ন করে তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে মরে গেল।

আমরা বলি অক্ষির অর্থ চোখ। তার মানে, চোখের বদলে বসছে অক্ষি। টাকাকড়ির ভাল নাম অর্থ। তার মানে টাকাকড়ির কাজ অন্য কিছুর বদলে বসা, শুধুমাত্র বাহন হওয়া। টাকাকড়ির জন্মও সেই কারণে। কিন্তু টাকাকড়ি শেষ পর্যন্ত আর ঠিক অর্থ হিসেবে রইল না। তার ভাবখানা দাঁড়াল এই যে, আমিই সব; আমাকেই শুধু দেখ। এতদিন টাকাকড়ি ছিল জিনিসপত্রের বাহন, এবার জিনিসপত্রগুলোই হল টাকাকড়ির বাহন। টাকাকড়ি বাদবাকি সকলের ঘাড়ে চেপে বসল।

॥ উল্টো ছাপ ॥

আয়নায় যেমন উল্টো ছাপ পড়ে, ডান দিকটা হয়ে যায় বাঁ দিক—তেমনি টাকাকড়িও তার আয়নায় সব কিছু উল্টো করে দেখাতে লাগল। দেখা গেল:

মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে যদি কড়ি থাকে।
নির্ধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে॥

লোকে জিগ্যেস করল: পৃথিবীটা কার বশ? প্রতিধ্বনিতে তার উত্তর পাওয়া গেল: পৃথিবী টাকার বশ।

যার টাকা, তার বল। কাজ হয়ে গেল ছোট। টাকা হল বড়। টাকা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায়। সব কিছুই কানা কড়ির কেনা-গোলাম। টাকায় পাওয়া যায় আত্মীয়-বন্ধু। টাকার অবাধ গতি।

টাকা, টাকা, টাকা।
গোপলা হল গোপাল জ্যাঠা, মঙ্গলা হল কাকা॥
টাকা, তুমি যাও কোথা?
পিরীত যথা।
আসবে কবে?
বিচ্ছেদ যবে॥

আইন-আদালতও টাকার মুঠোয়। তাই কথায় বলে: টাকা যার, মামলা তার। টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।

শুধু কাঠের পুতুল কেন, দেবতারাও বড়লোকের দুয়োরে বাঁধা পড়েন। গরিব লোকে তাই দুঃখ করে বলে:

কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই।
কড়ি পেলে কৃষ্ণ পাই॥

এতদিন প্রজার মাথার ওপর ছিল জমির মালিক রাজা। চাষীরা তাকে চোখে দেখত, তার পেয়াদার হাতে মার খেত আর ফসলে খাজনা গুনত। সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল প্রত্যক্ষ। তাতে বোঝা যায়, তার কাছে দরবার করা যায়।

কিন্তু আস্তে আস্তে বাজার আর টাকাকড়ি হয়ে উঠল মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। তার নিচে চাপা পড়ল মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্ক। টাকাকড়ির পাল্টানে পড়ে এক অদৃশ্য সুতোয় মানুষের ভাগ্য বাঁধা পড়ল।

।। মানুষের হাতে ।।

চ্যাংমুড়ি-কানির মতো এক অন্ধ নিয়তির হাতে আক্রান্ত হল মানুষের জীবন-ধন-মান। এক ক্ষমাহীন অভিশাপের মধ্যে যেন এ যুগের সকাল হচ্ছে :

জাগো, ওহে বেহুলা, সায়বেনের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা, মোরে খাইল কী ?

চাঁদ সদাগরের কাছে মনসা হল চ্যাংমুড়ি-কানি। মনসার পায়ে চাঁদ কিছুতেই মাথা নোয়াতে রাজী নন। ফলে চাঁদ সদাগরকে হারাতে হল ছয়-ছয় পুত্র, সাত-সাত ডিঙা। চাঁদ তবু প্রতিজ্ঞায় অবিচল।

বংশের শেষ বাতি লখিন্দরকেও মনসার হাত থেকে বাঁচান গেল না। স্বামীর শব নিয়ে কলার ভেলা ভাসালেন বেহুলা। শেষ পর্যন্ত লখিন্দর ফিরে পেল প্রাণ। চাঁদ ফিরে পেলেন তাঁর সাত-সাত পুত্র, তাঁর চৌদ্দডিঙা মধুকর।

কিন্তু ঘাট স্বীকার করতে হল নিয়তির কাছে। মনসাকে পুজো দিতে হল। কিন্তু চাঁদ পুজো দিলেন বাঁ হাতে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। পরাজয়ের মধ্যেও মাথা তুলে থাকল বিজয়ীর প্রতি বিজিতের অবজ্ঞা। মনসা পুজো পেলেন। কিন্তু সে পুজোয় শ্রদ্ধা থাকল না। চাঁদ সদাগরের ফেরান মুখে জেগে থাকল নিয়তির প্রতি নিরুপায় মানুষের চাপা রাগ। কোন একদিন জ্বলে ওঠবার অপেক্ষায়। আর শমীবৃক্ষে তোলা থাকল চাঁদ সদাগরের সেই হেঁতালের লাঠিগাছটি।

পালট পুরাণ

আকাশ-ছোঁয়া প্রকাণ্ড বাড়ি। তার পাশেই প'ড়ো জমিতে এক-খাটালে মোষ-মানুষ। হুস্ করে ছুটে যায় ট্রাম আর বাস। তার গা ঘেঁষে টিকিয়ে টিকিয়ে চলে গরুর গাড়ি ঠেলা-গাড়ি। হাসপাতালের সামনে গাছগাছড়া পোকামাকড় বিছিয়ে বসেছে দাড়িওয়ালা হেকিম। সেকাল আর একাল যেন আড়াআড়ি হয়ে আছে।

বারোয়ারি পুজোয় তরজা গান হয়। গাঁ থেকে নাম-করা কবিওয়ালা আসে। সঙ্গে ঢোল-কাঁসি আর একদল দোহার। আসরে দাঁড়িয়ে একটানা গড় গড় করে গান বলে।

॥ কবিতা বলা ॥

শুনে খুব ভালো লাগল। আসর ভাঙবার পর কবিওয়ালাকে গিয়ে বলা গেল : আমাদের কাগজের জন্যে একটা কবিতা লিখে দিন না। কবিওয়ালা বলবে : আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। লিখতে তো জানি নে।

সে কি কথা! আচ্ছা, আসরে যেটা বললেন সেটাই আরেকবার না হয় বলুন—লিখে নিই।

কবিওয়ালা বলবে : তা কি ছাই মনে আছে! তখন আসরে দাঁড়িয়ে ভাব এসেছিল বলেছি।

লেখার সঙ্গে কবিওয়ালার আড়ি। লোকজন ভিড় না করলে, ঢোল-কাঁসর না বাজলে, দোহারের দল ধুয়ো না ধরলে তার কবিতা বেরোয় না। কবিওয়ালা কবিতা লেখে না, কবিতা বলে।

দিন দিন তার পশার কমে আসছে। গাঁয়ের লোকের হাতে পয়সা নেই। আগে তবু জমিদারবাবুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে ডাক পড়ত। আজকাল তাঁরা শহরের বাসিন্দা। শহরে আবার সিনেমা-থিয়েটারের দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই কবিওয়ালার গান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পেটের দায়ে আজ তাকে হতে হচ্ছে হয় গাঁয়ের জনমজুর, নয় শহরের কুলি। ছাপাখানা, সিনেমা, রেডিও, গ্রামোফোনের কাছে দিন দিন তাকে হটে যেতে হচ্ছে।

॥ কবিতা লেখা ॥

কবিওয়ালার জুড়িদার হয়ে দেখা দিয়েছে কবি। সে কবিতা বলে না, কবিতা

লেখে। একা ঘরের মধ্যে নিরিবিলিতে বসে লেখে। সে কবিতা বই হয়ে ছেপে বাজারে যায়। বাজার থেকে যায় পাঠকের ঘরে। পাঠক সে কবিতা ভিড়ের মধ্যে বসে শোনে না। একা একা নিরিবিলিতে বসে মনে মনে পড়ে। এই হল একালের কবিতা।

কবি হয়ে পড়েছে একা। পাঠকও একা। ভাবের ঘোরে লেখা নয়। ভেবে চিন্তে লেখা। তা ছাড়া আজকের দিনে লেখা অমনি মুখের কথা নয়। লেখার জন্যে অনেক তালিম দরকার। যে কেউ ইচ্ছে হলেই লিখতে পারে না।

কবিওয়ালা যে ভাষায় গান বাঁধে, সে ভাষায় গাঁয়ের মানুষ কথা বলে। তাই তার গান সবাই বোঝে। লেখাপড়া জানা না জানায় কোন তফাত হয় না। কবিওয়ালা হল গাঁয়ে দশজনের একজন। যারা মাঠে ধান বোনে, কামারশালে হাপর টানে, করাত দিয়ে কাঠ চেরে—তাদেরই সঙ্গে তার ওঠা-বসা, তাদেরই ভাগ্যের সঙ্গে জড়ান তার ভাগ্য। আসলে যে গান সে গায়, তা একা তার নয়। সকলের মনের কথাটাকে গানের মধ্যে সে ধরে দেয়। গোটা গ্রাম যেন তার মুখ দিয়ে কথা বলে।

।। মুখে বলা আর লিখে বলা ।।

মুখে বলা আর লিখে বলা। এ দুইয়ে তফাত আছে। প্রথম তো চাই অক্ষরজ্ঞান। পড়তে আর লিখতে শিখতে হবে। জানতে হবে বানান, বাক্য, যতিচিহ্ন—সব-কিছুর নিয়মকানুন। যাতে উদর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না পড়ে। কাউকে চিঠি লেখার সময় আমরা কী করি? কোন্ দেশ কোন্ রাজ্য কোন্ শহর কোন্ রাস্তা কত নম্বর বাড়ি—চিঠির ঠিকানায় সবকিছুর হদিশ দিই। তবে সেই চিঠি ঠিক জায়গায় পৌঁছোয়।

যাকে আমরা ব্যাকরন বলি, তারও কাজ হল নির্ভুল ঠিকানা দেওয়া। যখন আমরা সামনাসামনি কথা বলি, তখন অনেক সুবিধে। মুখে না বলে অনেক কথা গলার স্বরে কিংবা হাত-মুখ নেড়েও বুঝিয়ে দিই। এমন কি মুখ ফসকে ভুল কথা বললেও, প্রসঙ্গ বুঝে কিংবা প্রশ্ন করে ঠিক কথাটা জেনে নিতে পারি।

লেখার বেলায় তো আর তা চলবে না। কাজেই লেখার মধ্যে সমস্ত আটঘাট বেঁধে দিতে হয়। পড়ে কেউ যেন পারতপক্ষে ভুল না বোঝে।

শুনে সহজ মনে হয়। কিন্তু হাতে কলম নিলে দেখা যায় কাজটা শক্ত। পড়ে পড়ে আর লিখে লিখে মক্‌শো করতে হবে। তবে লেখার হাত পাকা হয়।

।। শ্রোতার জায়গায় পাঠক ।।

লেখার টানে গোড়ায় গাছের পাতা, তারপর এসে গেল কাগজ। মূলে লেখা হবে একটা। তা থেকে করতে হবে হাতে লিখে নকল। যারা লিখতে আর নকল করতে পারত, তাদেরই বলা হত বিদ্বান। যাদের বলবার কথা শুধু মুখেই ঠেকে রইল, তাদের বলা হল মুখ্যু। বিদ্বানের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। বাদবাকি সবাই মুখ্যু।

মুখ্যু মানে যে অজ্ঞ বা আহাম্মক তা কিন্তু নয়। আসলে জানবার দিক থেকে তার সম্বল খুব কম। তার জ্ঞান হয় শুধু দেখে, শুনে আর ঠেকে। যে বিদ্বান সে উপরন্তু পড়ে জানতে পারে। অনেক সময় পড়ে জানাটা উঁচুদরের জ্ঞান হতে পারে। কিন্তু দেখে, শুনে আর ঠেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় অনেক সময় তার দামও কম নয়।

কাগজের পর এসে গেল ছাপাখানার যুগ। তখন বিদ্বানের সংখ্যা যেমন লাফ দিয়ে বেড়ে গেল, তেমনি মুখ্যুর সঙ্গে বিদ্বানের তফাতটাও হয়ে দাঁড়াল আকাশ পাতাল। একদল হল শিক্ষিত, আরেকদল হয়ে রইল নিরক্ষর।

রাজা গিয়ে পৃথিবীতে এখন এসেছে প্রজাতন্ত্র আর গণতন্ত্রের যুগ। নিরক্ষরতাকে ঘুচিয়ে না দিতে পারলে মানুষের মুক্তি নেই।

ছাপার হরফ দুনিয়ায় এনেছে এক মস্ত বড় বিপ্লব। সব কিছুই সবাইকে জানান যাবে। সবাই পড়তে লিখতে পারবে। যন্ত্র এনে দিয়েছে তার সুযোগ। এবার সমাজ তার ব্যবস্থা করুক।

আগে ছিল শুধু কান পেতে শোনা। এখন চোখ লাগিয়ে পড়া। আগে ছিল শুধু শ্রোতা। এখন ক্রমবর্ধমান পাঠক।

পড়ে শুনে মানুষ আজ দুনিয়াকে বদলাচ্ছে। আগে ছিল শুধু হাত। এখন হাতে হাত মিলিয়েছে মাথা। কলে কারখানায় ক্ষেতে-খামারে যা ছিল শুধুই হাতের কাজ, আজ মাথার কাজ তার জায়গা নিচ্ছে।

কর্মীতে আর শিল্পীতে আর তফাত থাকছে না। কাজের আঙিনা থেকে সবাই আসছে শিল্পের আঙিনায়।

অক্ষরে অক্ষরে একথা সত্যি হয়ে চলেছে।
